শেষবেলায়

শেষবেলায়

প্রভা প্রকাশনী
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
১ কে, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-১২

শেষবেলায়

আজ নিয়ে এই তৃতীয় দিন মেয়েটিকে দেখলেন শুভময়। একই জায়গায়, পার্কের একই বেঞ্চিতে। সঙ্গে আধা পঙ্গু ছেলে।

ইদানীং মাঝেমধ্যে আবার প্রাতঃভ্রমণে বেরোচ্ছেন শুভময়। একসময়ে অভ্যেসটা তাঁর নিয়মিতই ছিল, রিটায়ারমেন্টের পর থেকেই। তখন শীত হোক, গ্রীষ্ম হোক, বৃষ্টি নামুক, কুয়াশা থাকুক, শুভময় উঠে পড়তেন কাকভোরে, সূর্য ওঠার ঢের আগেই নিজে হাতে বানানো এক কাপ চা খেয়ে, জুতো-মোজা গলিয়ে সোজা রাস্তায়। সাজপোশাকেও তখন ভারী বাহার ছিল শুভময়ের। গরমের দিনে রংচঙে টিশার্ট অথবা ধবধবে সাদা তোয়ালে গেঞ্জি, শীতে লোভনীয় ডিজাইনের পুলওভারের সঙ্গে বিলিতি হ্যাট্। পরমাকে নিয়ে একবার কন্টিনেন্ট ট্যুরে গিয়েছিলেন শুভময়, তখন খোদ লন্ডন থেকে এনেছিলেন টুপিটা। স্রেফ মর্নিংওয়াকের জন্য এক জোড়া দামি স্পোর্টস শ্যু'ও কিনেছিলেন শুভময়। চলনে বলনে তখন স্পষ্ট বোঝা যেত শুভময় হেঁজিপেঁজি লোক নন, সাহেবি কেতাকানুনে রীতিমতো দুরস্ত্ ডি-ভি-সির প্রাক্তন চিফ ইঞ্জিনিয়ারটির শরীরে বয়স মোটেই তেমন দাঁত বসাতে পারেনি। হাঁটতেনও তখন বেশ জোরে জোরে, লম্বা লম্বা পায়ে। ঘুরে ঘুরে তাকাত গোল্ডেন পার্কে জগিং করতে আসা ছেলে-ছোকরারা। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত, ওরে মেসোমশাইকে দ্যাখ্, *একেই বলে অক্ষয় যৌবন!*

ওই সব বিশেষণ তখন শুভময়কে দারুণ পুলকিত করত। চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও তিনি যে ফুরিয়ে যাননি, এই অনুভূতি দেহকে যেন আরও চনমনে করে তুলত। শরীর তাঁর এখনও বড় একটা টসকায়নি, কিন্তু ওই মন্তব্যগুলোকে এখন যেন কেমন টিটকিরির মতো লাগে। মাত্র আড়াই বছরে তিনি যে ভেতর থেকে অনেকটাই ধসে গেছেন, এ খবর তাঁর চেয়ে বেশি আর কে

জানে!

পরমাই তাঁকে ধসিয়েছেন। দুম করে মরে গিয়ে। কথা নেই, বার্তা নেই, সন্ধেবেলা বসে টিভি দেখতে দেখতে হঠাৎই বুক চেপে উফ্ আর্তনাদ, পরমুহূর্তে সব শেষ। ধাক্কাটা যেন স্থবির করে দিয়েছিল শুভময়কে। সেজেগুজে সকালে বেরোনোর ইচ্ছেটাও মরে গিয়েছিল তখন থেকেই। ঘুম ভাঙত নিয়মিত, কিন্তু কী এক তীব্র আলস্য যেন ভর করত শরীরে। চোখ খুলতে ইচ্ছে করে না, বিছানা ছাড়তে ভালো লাগে না.....। সর্বক্ষণ মনে হয়, আর কী হবে, আর কী দরকার! বুকের ভেতর বাতাস বইছে হুহু, ওই ভোরবেলাতেও। কান্না পেত। সত্যি বলতে কি, দু' একদিন বালিশে মুখ গুঁজে কেঁদেছেনও। বিড়বিড় করেছেন, কেন চলে গেলে পরমা? আমায় একা ফেলে কেন চলে গেলে?

তা মিলন-বিরহ সবই তো অভ্যেস। সবই সয়ে যায়। নিকষ কালো অন্ধকারের মতো শোকও ক্রমশ ফিকে হয়ে আসে। পরমা আর মাথা খুঁড়লেও ফিরবে না, একা হয়ে গেলেও শুভময়কে এখন বেঁচে থাকতে হবে, এটাই তো রূঢ় সত্য।

একটু একটু করে সত্যটাকে মেনে নিয়েছেন শুভময়। একা জীবনেরও একটা নিজস্ব ছন্দ আছে, টের পাচ্ছেন ক্রমশ। এখন আবার ভোরে উঠে প্রথমে নিজের জন্য এক কাপ চা বানিয়ে ফেলেন। একবার ডাকলেই অবশ্য জগন্নাথ উঠে পড়বে, তবু স্বহস্তে চা বানানোর অভ্যেসটাকে আবার ফিরিয়ে এনেছেন। বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে রোজ একটা করে সকাল ফুটে উঠতে দেখেন শুভময়। দুধের গাড়ি চলে গেল ভোর মাড়িয়ে, সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পেড়েছে খবরের কাগজঅলারা, খুব নিচু দিয়ে উড়ে গেল একটা কাক, ঘুম ভাঙতেই চড়ুই দম্পতি কিচমিচ শুরু করেছে.....সব মিলিয়ে প্রতিটি ভোরেরই একটা আলাদা সৌরভ আছে। শুভময় তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেন টাটকা গন্ধটাকে। কোনও দিন মন হল তো বেরিয়েও পড়লেন, পাজামার ওপর খদ্দরের পাঞ্জাবিটা চাপিয়ে। এখন আর দ্রুত পায়ে হাঁটা নয়, এখন যেন প্রতিটি পদক্ষেপকে শুভময় পৃথকভাবে উপলব্ধি করেন। মনে হয় এ যেন এক অন্য জীবন। অন্য বেঁচে থাকা।

বেশি দূর যান না শুভময়। বাড়ি থেকে শ'খানেক পা গেলে চার মাথার মোড়, বাঁয়ে ঘুরে মিনিট দুয়েকের মধ্যে গোল্ডেন পার্ক। ব্যস্, পার্কেই যাত্রা শেষ। পার্কে একটা অবিন্যস্ত ঝিল আছে, হাঁটেন তার পাড় ধরে ধরে। শহরতলি বলে এদিকটায় এখনও কিছু সবুজ আছে, পাখি-টাখি ডাকে। শুভময় থমকে দাঁড়িয়ে দেখেন পাখিদের । শোনেন কান পেতে কখনও কোনও অচেনা পাখির ডাক শোনা যায় কিনা। তারপর আবার হাঁটা। ঝিলটাকে পুরো এক পাক ঘুরে এসে বেঞ্চিতে

খানিকক্ষণ বসে থাকেন চুপচাপ। সূর্য ওঠার পরও। যতক্ষণ না সূর্য রং বদলায়।

সকালবেলা আরও অনেক মানুষ আসে পার্কে। বিশেষত স্থানীয় বৃদ্ধরা। তারা একটু হাঁটল কি হাঁটল না, দখল করে নেয় পার্কের বেঞ্চ। শুরু হয় আড্ডা, গপ্পো, বধূনিন্দা, পুত্রনিন্দা, ব্যাংকে জমাখরচের হিসেব-নিকেশ। নিন্দেই এদের প্রাণশক্তি, হিসেব-নিকেশই এদের বেঁচে থাকার রসদ। শুভময়ের পছন্দ হয় না। মনে হয় সুন্দর সকালটা কলুষিত হয়ে যাচ্ছে। পারতপক্ষে শুভময় ওই সব মানুষদের ধারে কাছে যান না। তার চেয়ে এলোমেলো ছুটে বেড়ানো ছেলেমেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকা ঢের ভালো।

আজও চক্কর শেষ করে শুভময় একটা ফাঁকা বেঞ্চি খুঁজছিলেন। তখনই চোখে পড়ল মেয়েটাকে। পঙ্গু ছেলে আধো আধো স্বরে কী যেন একটা বলছে মাকে, কথা বলতে গিয়ে লালা গড়াচ্ছে মুখ দিয়ে। উত্তেজিতভাবে কৃষ্ণচূড়া গাছের দিকে আঙুল দেখাল ছেলে। মা ঘাড় নেড়ে নেড়ে কী যেন বোঝাচ্ছে ছেলেকে। ভারী যত্ন করে আঁচলে ছেলের মুখ মুছে নিল।

এক একটা দৃশ্য হঠাৎ করে মনে গেঁথে যায়। শুভময়ের বুকটা তিরতির করে উঠল। আহা, ছবিটা যেন ভরিয়ে দিল আজকের সকালটাকে।

মেয়েটি থাকে কোথায়? এ অঞ্চলেই কি? তাই হবে। শুভময়দের হাউজিং সোসাইটির বিস্তার বিশাল। চার-পাঁচশো প্লট আছে এখানে, বাড়ি হয়েছে কম করে শ'তিনেক। কোথায় কে কখন এল, ঠাহর করা মুশকিল। অনেকে তো বাড়ি করেও থাকে না, ভাড়া দিয়ে দিচ্ছে। এ মেয়েটিও সেভাবেই কোথাও এসেছে হয়তো। বয়সে ঝিমলির চেয়ে বোধহয় বড়ই হবে। দেখে তো মনে হয় সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ। রোগা, বেশ রোগা। মাথায় লম্বা বলে আরও যেন রোগা লাগে। শ্যামলা শ্যামলা রং, মুখে একটা আলগা শ্রী আছে। চিবুকটি ভারী ধারালো। অমন তীক্ষ্ণ চিবুক মেয়েদের মুখমণ্ডলে আলাদা ব্যক্তিত্ব এনে দেয়। ছেলেটা বছর দশেকের। কম হওয়াও বিচিত্র নয়। এই ধরনের প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের শরীরের বাড় একটু বেশিই হয়।

ছেলে আবার দেখাচ্ছে গাছখানা। হাউহাউ করে বায়না জুড়েছে। ফুল চায়?

মেয়েটি উঠল। একেবারে নীচে ঝুঁকে আসা একটা ডাল থেকে চেষ্টা করছে ফুল ছেঁড়ার। নাগালে এসেও আসছে না ডাল।

সামান্য ইতস্তত করে শুভময় এগিয়ে গেলেন। স্মিত মুখে বললেন,—আমি কি সাহায্য করব?

মেয়েটি চমকে ফিরে তাকাল। অপ্রস্তুত হেসে বলল,—হাত পাচ্ছি না।

—পাওয়ার তো কথাও নয়। যত নিচে মনে হচ্ছে, তত নিচে তো নেই।

মেয়েটি টুকটুক মাথা নাড়ল।

দীর্ঘদেহী শুভময় ডালপালা সুদ্ধু একগোছা কৃষ্ণচূড়া নামিয়ে আনলেন। বেঞ্চি থেকে হাততালি দিয়ে উঠল ছেলেটা। দু হাত পাখির ডানার মতো ঝাপটে ঝাপটে ডাকছে শুভময়কে।

কাছে গিয়ে ছেলেটির হাতে ফুলের গোছা দিলেন শুভময়। সামান্য ঝুঁকে বললেন,—নাম কী তোমার?

—তয়তয়।

—তোতোন?

—নাআআআ। ছেলেটা জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল,—তয়তয়। তয়তয়।

মেয়েটি পাশে এসেছে। হাসি হাসি মুখে বলল,—ওর নাম তন্ময়।

—বাহ্, সুন্দর নাম তো। তন্ময় কী?

—সেন। তন্ময় সেন।

—আর তুমি? মানে আপনি?

—আমায় তুমিই বলুন। আমি মালবিকা।

—তোমরা কি এখানে নতুন?

—নতুনই প্রায়। মাস দেড়েক হল এসেছি।

—বাড়ি করে? না ভাড়া?

—কোনওটাই নয়। আমার এক মামাতো দিদি এখানে বাড়ি করেছে। বি ব্লকে। দিদি- জামাইবাবুরা অস্ট্রেলিয়া চলে গেল, ওরাই থাকতে দিয়ে গেছে আমাকে।

'আমাকে' শব্দটিতে কেমন একটা একাকীত্ব আছে যেন। কানে বাজল শুভময়ের। তবে তিনি আর প্রশ্নে গেলেন না। প্রথম আলাপেই অন্যের জীবন নিয়ে কৌতূহল দেখানো তাঁর অশোভন মনে হয়।

মালবিকা বলল,—বসুন না। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

সঙ্গে সঙ্গে তন্ময়ও উচ্ছ্বসিত। সিটে হাত চাপড়াচ্ছে,—বয়ন বয়ন।

শুভময় বেঞ্চিতে হেলান দিয়ে তন্ময়ের মাথায় হাত রাখলেন। কোঁকড়ানো ঘন চুল, আঙুল ডুবে ডুবে যায়। শরীরের তুলনায় মাথাটা রীতিমতো বড়, সারাক্ষণ মুখ হাঁ হয়ে আছে, জিভ বেরিয়ে থাকে, লালা ঝরে অবিরাম। কিন্তু চোখের মণিদুটো অস্বাভাবিক রকমের ঝকঝকে ঝকঝকে? না টলটলে? অশ্রুবিন্দু জমে আছে কি?

শুভময়ের মায়া হচ্ছিল। তন্ময়কে আলগা আদর করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন,—এ কি জন্ম থেকেই এরকম?

ছেলের ওপাশে বসেছে মালবিকা। প্রশ্ন শুনে একটুক্ষণ চুপ। তারপর ছোট্ট শ্বাস ফেলে বলল,—জন্মের আগে থেকেই। জেনেটিক ডিস অর্ডার। পেটে থাকার সময়েই ব্রেন ডেভেলাপ করেনি।

—ও।.......হাঁটারও তো দেখি সমস্যা আছে!

—ওই ব্রেন থেকেই। সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমেই গণ্ডগোল আছে যে।

—চিকিৎসা চলছে নিশ্চয়ই?

—ওই আর কি।....একসময়ে অনেক কিছু করা হয়েছিল। এখনও নিউরোলজিস্ট দেখেন, তবে আশা খুব একটা কেউই দেননি তেমন। সপ্তাহে তিন দিন দুপুরে ফিজিওথেরাপি চলে, ডাক্তারের কথা মতো হাঁটাই যতটা পারি...

কথা শেষ হল না, তন্ময় বিশ্রী অ্যা অ্যা শব্দ করছে। খেপে গেছে যেন হঠাৎ। কৃষ্ণচূড়ার পাপড়িগুলো ছিঁড়ছে দু'হাতে।

থতমত শুভময়কে মালবিকা ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারায় বলল, চুপ চুপ।

শুভময় ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলেন। তাকে নিয়ে আলোচনাটা তন্ময়ের মোটেই পছন্দ হচ্ছে না। ছেঁড়া ফুলের কুচি ঝেড়ে ঝেড়ে ফেলে দিল কোল থেকে। জোরে জোরে দুলছে। তন্ময় বোধহয় সবসময়ে একটা খুশির দুনিয়ায় থাকতে চায়, তার অসুস্থতা নিয়ে একটা শব্দও বুঝি সে শুনতে ভালোবাসে না।

অপ্রতিভ মুখে শুভময় তন্ময়ের মাথায় হাত রাখলেন,—কী গো, তুমি কি আমার ওপর রাগ করলে?

তন্ময়ের দুলুনি থামল।

—ইশ, ফুলগুলো ছিঁড়ে ফেললে? দ্যাখো দ্যাখো, ফুলগুলো কাঁদছে।

এবার ভুরু কুঁচকে ফুলগুলোকে দেখছে তন্ময়। ঘাড় হেলিয়ে।

—আর একটা হাসি হাসি ফুল পেড়ে দেব? নেবে?

তন্ময় মাথা দোলালো। নেবে।

উঠে গিয়ে ঝুঁকে পড়া ডালটাকে আবার ধরলেন শুভময়। সামনে আর ফুল নেই, যা আছে তা বেশ খানিক ওপরে, কিছুতেই হাত পাচ্ছেন না। ঝুপ করে একটা লাফ দিলেন ওপরের ডালটাকে ধরার জন্যে। হল না। আবার লাফালেন। আবার। উঁচু, কিছুতেই নাগাল পাচ্ছেন না। উল্টে কোমরটা খট করে উঠল।

বয়স্ক মানুষটার লম্ফঝম্ফ দেখে খিলখিল হাসছে তন্ময়। হাততালি দিচ্ছে। শুভময় হাত উল্টে ফিরে এলেন,—নাহ্, আজ হল না। ব্যাটারা পালিয়ে যাচ্ছে। দুষ্টু ফুলগুলোকে কাল ঠিক শায়েস্তা করব, হ্যাঁ?

তন্ময় মাথা নাড়ল। আবার সে ফিরে এসেছে আনন্দের জগতে। কলকল করছে কী যেন। খুশির নির্যাসটুকু ছাড়া আর কিছুরই মর্মোদ্ধার করতে পারলেন না শুভময়।

মালবিকা ঠাট্টার সুরে বলল,—আপনিও যেমন। ওভাবে লাফাচ্ছিলেন, যদি লেগে যেত?

একটু টনটন তো করছেই, তবু ব্যথাটাকে শুভময় গায়ে মাখলেন না। হাসতে হাসতে বললেন,—বুড়ো হয়েছি বটে, তবে বন্ধুর জন্য এখনও এটুকু করতে পারি। ...কী গো বন্ধু, পারি না?

তন্ময় আহ্লাদে ডগমগ। বলল,—অঅঅঅ।

—হাত মেলাও তবে।

খপ করে শুভময়ের কব্‌জিখানা চেপে ধরল তন্ময়। বাপস্‌, ওইটুকু ছেলের গায়ে কী জোর! সর্বাঙ্গ ঝনঝন করে উঠল যেন। তবু একটা আলাদা জাতের রোমাঞ্চও যেন অনুভব করলেন শুভময়। তাঁর নিজের নাতি হাত চেপে ধরলে যে ধরনের অনভূতি হয়, এ যেন তার থেকে ভিন্ন ধরনের। যেন এক নির্বান্ধব বালক শুধু বন্ধুত্বের লোভে তাঁকে আঁকড়ে ধরেছে প্রাণপণে। নিশ্চয়ই তন্ময়ের সেরকম কোনও সঙ্গী নেই, স্বাভাবিক ছেলেপুলেরা বিকলাঙ্গদের সঙ্গে মোটেই মেশে না। তাছাড়া ওই বয়সের ছেলেরা খুব নিষ্ঠুরও হয়, তারা তন্ময়ের মতো ছেলেদের ঠাট্টা বিদ্রূপ শ্লেষে পাগল করে ছাড়ে।

ব্যথা লাগা সত্ত্বেও তন্ময়ের হাত ছাড়ালেন না শুভময়। বরং নিজেও আলগা চাপ দিলেন তন্ময়ের হাতে।

মালবিকা ঘড়ি দেখছে। বলল,—আজ তবে উঠি?

—এক্ষুনি? শুভময় বলে ফেললেন,—কেন, কটা বাজে?

—সাতটা দশ। বাড়ি গিয়ে ছেলেকে তৈরি করতে হবে, তারপর নটার মধ্যে অফিস বেরোনো আছে.....

—তুমি চাকরি করো?

—ওমা, নইলে চলবে কী করে?

দিব্যি অনাড়ষ্ট ভঙ্গি। স্বচ্ছ স্বর। শুভময় তবু যেন হোঁচট খেলেন একটু। আপনাআপনি চোখ চলে গেছে মালবিকার সিঁথিতে। বুঝতে পারলেন না সিঁদুরের রেখা আছে কিনা। অবশ্য আজকাল সিঁথি দেখে সধবা-বিধবা আন্দাজ করা কঠিন। ঝিমলিই তো অর্ধেক দিন সিঁদুর পরে না। পরমা এ নিয়ে গজগজ করতেন মাঝে মাঝে, ঝিমলি ঠাট্টা করে বলত, আমার সিঁদুর পরা না পরার ওপর যদি অনুপমের

বেঁচে থাকা ডিপেন্ড করে, তবে অনুপমের অমন প্রাণ না রাখাই ভালো। মালবিকাও হয়তো তেমনই....। উঁহু, মালবিকা তো আগেই তার একাকীত্বের ইঙ্গিত দিয়ে দিয়েছে। মেয়েটা কি তবে ডিভোর্সি? নাকি বিধবা?

সরাসরি কৌতূহল প্রকাশ না করে শুভময় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,—ছেলে কার কাছে থাকে সারাদিন?

—রাতদিনের লোক আছে একজন। মেয়েটা ভালো, ওই সারাদিন বাবুকে দেখে। বলতে বলতে হাসছে মালবিকা,—শুধু চানটাই আমায় করিয়ে দিয়ে যেতে হয়। বাবু কিছুতেই এখন আর অন্য কারুর কাছে চান করবে না।

—তাই নাকি? কেন?

—লজ্জা। ছেলের আমার রাগ লজ্জা অভিমানটা একটু বেশি।

মস্তিষ্ক পরিণত নয় বলেই কি তন্ময়ের আবেগ বেশি প্রখর? হয়তো বা। মস্তিষ্কের কোষ যথা নিয়মে পুষ্ট হলে হয়তো হৃদয় শুকিয়ে আসে!

মালবিকা উঠে পড়েছে। শুভময় তন্ময়কে তুললেন ধরে ধরে,—চলো তাহলে, একসঙ্গেই ফিরি। আমার নতুন বন্ধুকে একটু এগিয়ে দিই।

—আপনি কোন দিকটায় থাকেন?

—আমার ই ব্লক। তোমাদের বি ব্লকের পেছনে। গেছ ওদিকটায়?.............ওই যে.............যেদিকে একটা দুধের ডিপো আছে.........ডিপোর উল্টোদিকেই তো আমার বাড়ি। ক্রিম কালার। দোতলা। গেটের দু'পাশে দুটো দেবদারু গাছ আছে।

—ওমা, ওইটা আপনার বাড়ি? মালবিকা হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিল। বৈশাখের প্রভাতী সূর্য এখনই বেশ তেজী হয়ে উঠেছে, রোদ্দুর সোজাসুজি এসে হানা দিচ্ছে মালবিকার মুখে, হাত তুলে নিজেকে আড়াল করতে করতে বলল,—বাড়িটা খুব সুন্দর!

—তুমি বাড়িটা চেনো?

—সুমতির মাঝে শরীরটা খারাপ হয়েছিল, তখন দুধ আনতে গিয়ে দেখেছি। দেখেই বোঝা যায় গৃহকর্তার রুচি আছে। মালবিকা মুখ টিপে হাসল,—বাইরেটাও কী চমৎকার সাজানো।

—ওই সাজানোর কৃতিত্বটা কিন্তু পুরোটাই গৃহিণীর। শুভময় মাথা নাড়লেন,—তার খুব শখ ছিল একটু খোলামেলায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকবে, একটু বাগান-টাগান করবে....তা সে তো সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখে চলেই গেল।

—তিনি নেই?

—নাহ্। ওই ভূতের বাড়িতে আমি এখন একাই.....

—আপনার ছেলেমেয়ে.....?

—আছে যে যার জায়গায়। ছেলে বউ বাচ্চা নিয়ে পুনেতে, মেয়ে শ্বশুরবাড়ি। জগন্নাথ বলে একটি ছেলে আছে, বছর বারো-তেরো বয়সে আমাদের কাছে এসেছিল, সেই এখন ঘরসংসারের দেখভাল করে। আমারও। মানে ও ব্যাটাই এখন আমার গার্জেন।

কথা বলতে বলতে এগোচ্ছেন শুভময়। ছেলের অন্য হাত ধরে মালবিকাও। দু'দিক থেকে দুজনের হাতে ভর দিয়ে তন্ময় চলেছে বেঁকেচুরে। ঘুরে ঘুরে দেখছে ঝগড়ুটে শালিক, উড়ন্ত কীটপতঙ্গ, নিদ্রিত কুকুর......। গোলাপি ডানার ওপর কালো ছিটছিট প্রজাপতি দেখে তো দারুণ মোহিত। আনন্দের ধ্বনি বেজে উঠল গলায়।

আনন্দটা শুভময়ের বুকেও চারিয়ে যাচ্ছিল। বহুদিন পর এক পঙ্গু বালক যেন তাঁর সকালটাকে অন্য রকম করে দিল। এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না বাড়ি ফিরেই শুরু হবে সেই একঘেয়ে জীবন। সেই খাওয়া, খবরের কাগজ মুখস্থ করা, দু' একটা বইপত্র উল্টোনো, একটু টিভি খোলা, কি কম্পিউটারের সামনে বসা, স্নান, খাওয়া, বিশ্রাম বিশ্রাম....

আর দোতলার ইজিচেয়ারে অনন্ত বসে থাকা।

দুই

ঝিমলি এলে রীতিমতো সাড়াশব্দ পড়ে যায় বাড়িতে। এই এটার তদারকি করছে, ওটার খোঁজখবর চালাচ্ছে, ঘরদোর সাফসুতরো করা নিয়ে তুড়ে বকাবকি করছে জগন্নাথকে.....সে এক হুড়ুদ্দুম কাণ্ড। তার এক্সরে চোখকে কোনও ভাবেই ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই, বাড়ি ঢুকেই সে লেগে পড়ে কাজে। প্রথমে চলে পরিদর্শন পর্ব, তারপর নির্দেশ ছোঁড়ার পালা। বিছানার চাদর থেকে সে প্রায় অদৃশ্য ময়লা বার করতে পারে, ঘরের খাঁজখোঁজ থেকে ধুলোর আস্তরণ, নিত্যি ঝাড়পোঁছ সত্ত্বেও কোথায় কোন সিলিং-এর কোণে এক কণা ঝুল জমেছে তাও তার নজরে পড়বেই। বেচারা জগন্নাথের তখন প্রায় হিমশিম দশা।

দ্বিপ্রাহরিক আধো তন্দ্রায় শুভময় শুনতে পাচ্ছিলেন ঝিমলির গলা। জোর হম্বিতম্বি চালাচ্ছে জগন্নাথের ওপর। আজ এমন অসময়ে ঝিমলি কেন? সে তো আসে মোটামুটি ছুটির দিনে, কিম্বা সন্ধেবেলায়! পরমা মারা যাওয়ার পর প্রায় রোজই একবার অফিসের পর আসত, এখন অবশ্য তা হপ্তায় একদিন-দু'দিনে এসে ঠেকেছে। তাও আসে তো। নাহলে ফোন করেও তো নেয় খোঁজখবর। বাবুলের তো সে সময়ও হয় না। একআধ দিন মন হল তো তিন মিনিটের জন্য একটা টেলিফোন, কখনও-সখনও কায়দা করে ই-মেলে দু-চার লাইন, ব্যস। কাছাকাছি থাকে বলেই কি ঝিমলির বাবার জন্য উদ্বেগটা বেশি? নাকি বাবা-মায়ের ওপর মেয়েদের টানটাই একটু বেশি হয়?

বিছানা ছেড়ে উঠলেন শুভময়। চশমাটা পরে নিয়ে পায়ে পায়ে এসেছেন ড্রয়িংরুমে। মুখে হাসি মাখিয়ে বললেন,—কী রে, তুই কখন এলি?

—এই তো, মিনিট দশেক। ঝিমলির কোমরে হাত,—বইগুলো সব সেন্টার টেবিলে ফেলে রেখেছ কেন? ড্রয়িংরুমে কেউ এভাবে বই ছড়িয়ে রাখে?

মুখে হাসি ধরে রেখেই শুভময় বললেন,—ড্রয়িংরুমে আর বাইরের লোকটা আসে কে?

—লোক আসে না বলে বাইরের ঘর যেমন তেমন হয়ে থাকবে?.........একসঙ্গে কটা বই পড়ো তুমি, অ্যাঁ? এখানে দুটো বাংলা গল্পের বই, ওখানে একটা ইংরিজি

বই.......... এন্‌শেন্ট হিস্ট্রির বইটা তো সোফায় গড়াগড়ি খাচ্ছিল। ঝিমলির গলায় অনুযোগের সুর,—তুমি কিন্তু আগে এরকম ছিলে না বাবা। সব কিছু কত টিপটপ রাখতে।

—আমি নয়, তোর মা রাখত।

—তা মা নেই বলে সংসারটা ছন্নছাড়া হয়ে যাবে? জগন্নাথ আছে কী করতে? নিজে না করো ওকে দিয়ে করাও।

জগন্নাথ তটস্থ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল। ঝিমলির মুখের কথা খসতে না খসতে ঝটাপট বইগুলোকে গুছিয়ে তুলে নিয়েছে। সাপটে ধরে ছুটেছে পাশের কামরায়, একসময়ে যে ঘরটা এ বাড়ির স্টাডিরুম ছিল, যেখানে শুধুই থরে থরে বই।

ঝিমলিও দৌড়েছে পিছন পিছন। দরজা থেকে নির্দেশ ছুঁড়ছে,—একদম উল্টোপাল্টা করে রাখবি না। বাংলা বই বাংলার জায়গায়, ইংরিজি ইংরিজির। ....উঁহু, ওটা ম্যাগাজিনের তাকে নয়, হিস্ট্রি যাবে ওপরের র‍্যাকে।

ঝিমলির হাতনাড়া, কথা বলার ভঙ্গি অনেকটাই ওর মায়ের মতো। ঘর সাজানোর ব্যাপারে খুঁতখুঁতুনিটাও ঝিমলি পেয়েছে পরমার কাছ থেকে। ভাবতে গিয়ে আলগা একটা শ্বাস ফেললেন শুভময়। কী হয় এত সব সাজিয়ে গুছিয়ে? সবই তো ফেলে রেখে চলে যেতে হয় একদিন।

স্টাডিরুম মনোমতো করে রেখে ফিরেছে ঝিমলি। সোফায় বসে রুমালে ঘাড়গলা মুছছে। মুখ তুলে ঘুরন্ত ফ্যানটাকে দেখে নিল একবার।

শুভময়ও বসেছেন। মেয়ের মুখোমুখি। ঠোঁট টিপে বললেন,—ওটাতে ময়লা জমেছে কিনা তা কিন্তু এখন বোঝা যাবে না।

—বয়েই গেছে বুঝতে। ঝিমলি হেসে ফেলল,—আমি কি এ বাড়ির জমাদার? যা খুশি করে রাখো, তাই বলি।

—আহা, জমাদার কেন হবি? তুই হলি কুইন ভিক্টোরিয়া।

—ঠাট্টা করছ?

—রানি এলিজাবেথও বলতে পারি। তা মহারানির আজ হঠাৎ অসময়ে আগমন যে?

—এ বাড়ি আসার সময়-অসময় আছে বুঝি?

—চটছিস কেন? ওয়ার্কিং ডে'তে বিকেল চারটেয় তো তুই....

—এদিকে একটা সাইটে এসেছিলাম। নতুন প্রজেক্ট শুরু হবে। কাজ তাড়াতাড়ি চুকে গেল, তাই ভাবলাম....

—এখানে কোথায় কাজ হচ্ছে তোদের?

—পৈলানে। একটা হাউজিং কমপ্লেক্স।

যাদবপুর থেকে আর্কিটেকচার নিয়ে পাশ করেছে ঝিমলি। চাকরি-বাকরির দিকে যায়নি, তিন সহপাঠী মিলে নিজস্ব ফার্ম তৈরি করেছিল। প্রথম দু-তিন বছর প্রায় মাছি তাড়াত ঝিমলিরা। সেই সময়ে বিয়েও হয়ে গেল ঝিমলির, পুচকুনও জন্মে গেল, কাজের উৎসাহে তখন ঝিমলির ভাটাও পড়েছিল কিছুটা। তারপর ছেলে একটু সাব্যস্ত হতেই আবার পূর্ণ উদ্যমে লেগে পড়েছে। গত ছ-সাত বছরে রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তাদের ফার্ম, কাজকর্ম পাচ্ছে নিয়মিত। এই তো, কিছুদিন আগে দমদমে একটা অডিটোরিয়ামের কাজ করল, সল্টলেকে একটা বড় স্কুলের প্ল্যান করার বরাত পেল, একখানা মাঝারি হোটেল বানিয়ে এল শিলিগুড়িতে। সঙ্গে টুকটাক বাড়িঘর, হাউজিং কমপ্লেক্স তো চলছেই।

শুভময় জিজ্ঞেস করলেন,—এটা কি বেশ বড় কাজ?

—খুব ছোটও নয়। একই কম্পাউন্ডের মধ্যে ছটা বাড়ি হবে। সিক্স ইনটু টুয়েলভ, বাহাত্তরখানা ফ্ল্যাট। কমিউনিটি হল থাকবে, জেনারেটার স্পেস, ওয়াটার রিজার্ভয়ার, বাচ্চাদের জন্য মিনিপার্ক, ব্যাগারা ব্যাগারা....

—বাহ্, ভেরি গুড। চালিয়ে যা। শুভময়ের মুখে তৃপ্তির হাসি,—তুই যখন আর্কিটেক্চার পড়তে চেয়েছিলি, তখন ভাবিইনি এ লাইনে তুই সত্যি সত্যি শাইন করবি।

—এখনও কিছুই হয়নি বাবা। মাইল্স টু গো।

—তোদের ফার্মে কী একটা প্রবলেম হচ্ছিল বলছিলি না?

—হ্যাঁ, রজতাভটা বেগড়বাঁই করছে। পায়ে পা লাগিয়ে ঝামেলা পাকাচ্ছে মাঝে মাঝেই। পসিবলি, ওর নিজের একটা সেপারেট বিজনেস করার ইচ্ছে।

—তো ওকে তোরা ছেড়ে দে। ধরে রেখেছিস কেন?

—একটু সেন্টিমেন্ট তো আছেই আমাদের। ন' বছর একসঙ্গে কাজ করছি....প্লাস, ওর ভালো ভালো কানেকশান আছে। আমরা ভয় পাচ্ছি ও আমাদের ক্লায়েন্ট ভাঙিয়ে নিতে পারে।

—তা বনিবনা না হলেও একসঙ্গে চলবি?

—উঁহু, তাড়াব। তবে ওর কন্ভিনিয়েন্ট টাইমে নয়, আমাদের সুবিধে মতো। বলতে বলতে ঝিমলি হাঁক পাড়ল,—জগা...? অ্যাই জগন্নাথ?

জগন্নাথ হোঁচট খেতে খেতে এসেছে,—ডাকছ দিদি?

—খাবারগুলো সব টেবিলেই পড়ে রইল? তুই কী রে?

শুভময় ভুরু নাচালেন,—কী এনেছিস?

—আঙুর আছে, আপেল, বেদানা.....

—অ্যাহ্, আমি কি রুগী?

—অন্য খাবারও আছে। চিকেন প্যাটিজ, পেস্ট্রি.....চলবে? না চললেও কিছু করার নেই, তোমাদের এই ধ্যধ্ধেড়ে গোবিন্দপুরে তো ওই একটাই মাত্র ভদ্রলোকের মতো দোকান। আগে থেকে তো আসার প্ল্যান ছিল না, তাহলে নয় আমাদের ওদিক থেকে কিছু নিয়ে আসতাম।

—এটা কিন্তু ঠিক বললি না ঝিমলি। এদিকেও আজকাল কম দোকান পাট হয়নি। তুই নেহাত বেটাইমে এসেছিস তাই...

—যতই লড়ে যাও বাবা, গোবিন্দপুর ইজ গোবিন্দপুর। চক্রবেড়িয়া থেকে আসা-যাওয়া করতে প্রাণ বেরিয়ে যায়।

—তাও তো আসিস গাড়িতে।

—হলেও বা। রাস্তাঘাটের যা ছিরি। প্লাস সময়।

—না এলেই পারিস।

—ওমনি ঠোঁট ফুলে গেল তো? ঝিমলি ঝুঁকে ছুঁল শুভময়কে,—মা মারা যাওয়ার পর তুমি একেবারে সেন্টুর ট্যাবলেট বনে গেছ বাবা। কাম অন্, চিয়ার আপ। এনজয় দা প্রেজেন্ট লাইফ। একা থাকারও কিন্তু একটা আলাদা চার্ম আছে।

মেয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে? না উপদেশ? এককালে শুভময়ের মনে হত ঝাড়া হাতপা মানুষরাই বুঝি সুখী বেশি। পরমা টিকটিক করলেই বলতেন, যেদিকে দু' চোখ যায় চলে যাব, তোমাদের সংসারের এই যাঁতাকল আর সহ্য হয় না। হায় রে, আজ তো তিনি মুক্তই, তবু মন হঠাৎ হঠাৎ বন্ধনের জন্য আঁকুপাঁকু করে কেন? মানুষ যে কী চায়?

আর যা চায় তাই বা মুখ ফুটে বলতে পারে কই? এই যে ঝিমলি মাসে বার পাঁচ-ছয় হানা দেয় এ বাড়িতে, ঝঞ্ঝার মতো আসে, ঘূর্ণির মতো চলে যায়, ভালো লাগে শুভময়ের, খুবই ভালো লাগে। তবে মনটা খচখচও করে তো। কত কথা জমে থাকে বুকে, অতীতের কত তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা আপন মনে বলে যেতে প্রাণ চায়, মনে হয় এও যেন এক নক্‌শি কাঁথায় ফোঁড় দেওয়া.....কিন্তু সে সব শোনার সময় কোথায় ঝিমলির! বাবুলের সঙ্গে মাপা সময়ের টেলিফোনে, কি চার লাইনের ই-মেলেও কি এঁকে দেওয়া যায় সে সব কথা?

শুভময় আলগাভাবে হাসলেন,—আমি আমার জীবনটাকে এনজয় করছি না, কে বলল তোকে? দিব্যি আছি।..........আমি বলতে চাইছিলাম, তোরা যদি সুযোগ পাস আসবি, সময় পাস আসবি....আফটার অল তোরা সব কাজের মানুষ। তুই, বাবুল....

—দাদার কথা বাদ দাও বাবা। দাদাটা একেবারে টিপিকাল ছাপোষা ফ্যামিলিম্যান। এবং স্বাভাবিক ভাবেই স্বার্থপর। নিজের বউ-বাচ্চা ছাড়া তার দুনিয়া নেই। কবে দাদা কার জন্য কী ভেবেছে বলো তো? আমি যেভাবে পাঁচজনকে নিয়ে থাকি....। বলতে বলতে ব্যাগ থেকে মোবাইল বার করে টকাটক নম্বর টিপছে ঝিমলি। খুদে যন্ত্রটা কানে একটুক্ষণ চেপে রেখে অন্য প্রান্তের সঙ্গে কথা শুরু করল,

—হ্যালো, মা? পুচকুন কোথায়?

—কেন? যাবে না কেন সাঁতার ক্লাসে?

....

—না না, ওকে একদম প্রশ্রয় দেবে না। বলো, আমি যেতে বলছি।

....

—আমি এ বাড়িতে। বাবার কাছে এসেছি।

....

—হ্যাঁ, বাবা ভালো আছে। ফিট।...........পুচকুনকে কষে দাবড়ানি দাও।

....

—বলতে পারছি না। রাত হতে পারে। ছাড়ছি।

ঝিমলির শাশুড়িকে নিয়ে কোনও প্রশ্ন করার অবকাশ পেলেন না শুভময়। নাতিকে নিয়েও নয়। ফোন শেষ করেই ফের ঝিমলি মোবাইলের বোতাম টিপছে টকটক। যন্ত্র কানে চেপে কথা জুড়েছে কেজো সুরে, অফিসের কারুর সঙ্গে। শেষ হতে না হতে মোবাইল এবার নিজেই বেজে উঠল। আবার কথা চলছে। বাক্যালাপের মাঝেই ঝিমলির চোখ ঘুরছে গোটা ঘরে, আঙুলের ইশারায় দেওয়ালে টাঙানো যামিনী রায়ের কপিটাকে মুছতে বলল জগন্নাথকে।

মিনিট পাঁচ-সাত পরে শেষ হয়েছে ফোনালাপ। হ্যান্ডসেট্ ব্যাগে পুরে জগন্নাথকে ফের হুকুম,—অ্যাই, ফলগুলো সব ধুয়ে রেখেছিস?

বাঁধানো ছবিটা দুরস্ত্ করে ফিরল জগন্নাথ,—এই রাখছি।

—রাখছি নয়, এখনই রাখ। আঙুরগুলোকে কম করে তিনবার ধুবি। আঙুর সব চেয়ে কন্টামিনেটেড ফ্রুট, ওতে সব চেয়ে বেশি পেস্টিসাইড পড়ে।

শুভময় হাল্কাভাবে বললেন,—এই সময়ে আঙুর আনতেই বা গেলি কেন? আম-টাম হলে নয় কথা ছিল।

—আম এখনও ভালো ওঠেনি বাবা। বাজারে এসেছে কিছু কারবাইড মারা হিমসাগর।

—হ্যাঁ গো দিদি, এ বছর বাজরে যেন আম আসছেই না। দামও খুব চড়া। তিরিশ টাকা কেজি, ভাবতে পারো? জগন্নাথ মাথা দোলাল,—আমি তো ঠিকই করে ফেলেছি, পনেরোর নিচে না নামলে আম কিনবই না।

—বক্তৃতা রেখে যা বললাম সেটা আগে কর। আর পারলে আমায় একটু চা খাওয়া।

জগন্নাথ চলে যেতে গিয়েও থামল,—চায়ের সঙ্গে তোমায় প্যাটিজ দিই?

—আমি খাব না, বাবাকে দে। তুইও খেয়ে নে গরম গরম।

শুভময় ভুরু কুঁচকোলেন,—তুই বা খাবি না কেন? খা। সারাদিন ছুটে বেড়াচ্ছিস............

—ধুস্, প্যাটিজ ভাল্লাগে না।

—তাহলে পেস্ট্রি খা।

—খেপেছ? দেখছ না, কেমন মুটোচ্ছি! পুচকুন পর্যন্ত সেদিন বলছিল, তোমার পেটে টায়ার গজাচ্ছে মা!

শুভময় শব্দ করে হেসে উঠলেন,—পুচকুন আজকাল এসব বলে নাকি? ভারী ওস্তাদ হয়েছে তো।

—কথায় তো তিনি একেবারে ঝুনো নারকোল। আজকাল কী ডায়ালগ ঝাড়ে জানো? প্লিজ মা, পড়াশুনো নিয়ে আমায় আর প্রেশার দিয়ো না, আমার ডিপ্রেশান হয়।

—সর্বনাশ, কোথথেকে শিখল এসব?

—স্কুলেই শিখছে। আজকালকার ছেলেমেয়েরা যা পাকা।

চোখ কুঁচকে মেয়েকে একটু দেখলেন শুভময়। তাঁর চৌত্রিশ ছুঁই ছুঁই মেয়েটা তেমন রূপসী নয় বটে, তবে একসময়ে ভারী লাবণ্য ছিল মুখে। কমনীয়তা অনেকটাই ঝরে গেছে এখন, কিছুটা বা সংসার করতে গিয়ে, কিছুটা বাইরের কাজকর্মের তাড়নায়। হাল্‌কা একটা উদ্বেগও যেন লেগে আছে মেয়ের মুখমণ্ডলে। ছেলেকে নিয়ে এখন থেকেই কি খুব টেনশন করে ঝিমলি?

শুভময় চোখ কুঁচকেই জিজ্ঞেস করলেন,—কিন্তু পুচকুন ওসব কথা বলে কেন? নিশ্চয়ই তুই ওকে খুব চাপ দিস?

—প্রেশার তো একটু দিতেই হয় বাবা।

—কিসের প্রেশার? সবে তো বেচারার ক্লাস থ্রি। মনে করে দ্যাখ তো, তোদের ওই বয়সে তোদের পড়াশুনো নিয়ে আমি কণামাত্র মাথা ঘামিয়েছি? তোদের মা হয়তো একটু ট্যাকট্যাক করত, আমি তাকেও মানা করতাম।

শুভময়ের কথাটাকে সেভাবে আমলই দিল না ঝিমলি। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল,—সময় বদলে গেছে বাবা। টাফ্ ডেজ্ আর অ্যাহেড নাউ। পুচকুনের দৌড় শুরু হয়ে গেছে, এখন এক পা পিছিয়ে পড়লে অন্যরা ওকে ধাক্কা মেরে টপকে যাবে। বাবা-মাকেও এখন প্রতিটি মুহূর্তে অ্যালার্ট থাকতে হয়।

পলকের জন্য তন্ময়ের মুখটা মনে পড়ল শুভময়ের। প্রায় পুচকুনের সময়ে পৃথিবীতে এসেও জন্ম থেকেই ছেলেটা ওই সব ইঁদুরদৌড়ের বাইরে। অপরিণত মস্তিষ্ক হওয়ার তবে কিছু সুফলও আছে, তন্ময় জোর বেঁচে গেছে। ছেলেটা সুস্থ স্বাভাবিক হলে মালবিকাও হয়তো ঝিমলির মতো করেই তন্ময়ের পিছনে লেগে থাকত।

আশ্চর্য, শুভময় হঠাৎ ঝিমলির সঙ্গে মালবিকার তুলনা টেনে আনলেন কেন? পুচকুনের সঙ্গে তন্ময়ের? শুভময়ের হাসি পেয়ে গেল। একটা স্নিগ্ধ কুলকুল স্রোত যেন চোরা ভাবে বয়ে গেল বুকের মধ্যে। কটা দিনেরই বা আলাপ, জোর দিন দশ-বারো, কিন্তু এর মধ্যে কী অদ্ভুত এক মায়ায় তাঁকে জড়িয়ে ফেলেছে তন্ময়। আগে ভোর হলে বেরোতেন নেহাতই অলসভাবে। গেলেও হয়, না গেলেও হয়, এমনই এক উদাসীন মেজাজে। এখন দিনের আলো ফুটল, কি ফুটল না, ওমনি বেরোনোর জন্য কী ছটফটানি। ওই খলখল হাসি, টলটলে চোখ যেন চুম্বকের মতো টানে শুভময়কে। ছেলেটার সঙ্গে দেখা হওয়া, বসে বসে অর্থহীন কিছু বুলি শোনা, কানের পরদায় তার খুশিটুকু মেখে নেওয়া.....এর জন্যই যেন শুভময়ের বেঁচে থাকা খানিকটা রঙিন হয়ে উঠেছে এখন। মাঝে একটা দিন মালবিকার ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছিল বলে আসেনি তন্ময়রা, সেই গোটা দিনটা শুভময়ের যে কী বিশ্রী কেটেছিল।

তন্ময়-মালবিকার গল্প বলবেন নাকি ঝিমলিকে?

সুযোগ পেলেন না। ঝিমলির ভ্যানিটিব্যাগে আবার সুরেলা ধ্বনি। সেল্‌ফোন ডাকছে।

ঝিমলি কামিজের ওপর ঘিয়ে রং ওড়না গুছিয়ে উঠে দাঁড়াল। টেলিফোনে কথা বলতে বলতে চলে গেল ভেতর বারান্দায়।

সেন্টার টেবিলে সিগারেট প্যাকেট আর লাইটার গড়াগড়ি খাচ্ছে। প্যাকেটটা হাতে তুললেন শুভময়। চারটে সিগারেট আছে এখনও। কাল বিকেলে কিনেছিলেন, মাত্র ছটা খরচা হয়েছে। এককালে ভয়ংকর নেশা ছিল ধূমপানের, দিনে দু-তিন প্যাকেট তো উড়েই যেত। পরমা বিরক্ত হতেন, নিষেধ করতেন, কিন্তু শুভময় কর্ণপাত করেননি তখন। অথচ কী আশ্চার্য, পরমা চলে যাওয়ার পরে ওই তীব্র আসক্তিটা

আপনাআপনি কমে গেল। মৃত্যুর ভয়ে নয়, তেমন কোনও বাহ্যিক কারণ ছাড়াই। কেন যে মরল? জগতে কত কিছুর যে কার্যকারণ খুঁজে পাওয়া ভার!

প্যাকেট থেকে একখানা সিগারেট বার করে নাড়াচাড়া করলেন শুভময়। এই মুহূর্তে একটা খেতে ইচ্ছে করছে, ধরাবেন কি? লাইটার জ্বালাচ্ছেন, নেবাচ্ছেন। ভাবতে ভাবতে ধরিয়েই ফেললেন। জগন্নাথ প্লেটে করে দুখানা প্যাটিজ রেখে গেল। মুখে তুলতে বিন্দুমাত্র উৎসাহ বোধ করলেন না। চোখ বুজলেন। তামাকের আমেজ গ্রহণ করছেন মস্তিষ্কে।

ঝিমলি ফিরেছে। দু' হাতে দুখানা চায়ের কাপ। একটা কাপ শুভময়ের সামনে রেখে বলল,—এ কী, শুরু করোনি এখনও? খাও খাও। অলরেডি এগুলো তো আধমরা।

শুভময় উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন,—এবার কে বাঁশী বাজাল?

ঝিমলি হেসে ফেলল,—স্বয়ং কেষ্টঠাকুর

—অনুপম? কী বলছে?

—এমনিই। এ সময়ে করে মাঝে মাঝে। হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে যায় বউ-এর একটু খোঁজখবর নেওয়া দরকার।............আজ অবশ্য কারণও আছে।

শুভময় বললেন না কিছু, তবে চোখে প্রশ্ন ফুটল।

ঝিমলি চোখ ঘোরাল,—বাপির জন্য কবে ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট করবে জিজ্ঞেস করছিল।

—কী হয়েছে বেয়াইমশায়ের?

—এই বয়সে যা হয়। ক্যাটার্যাক্ট। ডক্টর তানেজা দেখে বলবেন কতটা ম্যাচিওর করেছে, তারপর মাইক্রোসার্জারি।......আমার অবস্থাটা বোঝো, কবে ডাক্তারের ডেট নেবে তাও আমাকে বলে দিতে হবে।

অনুপম অনেকটাই ঝিমলির ওপর নির্ভর করে, ঝিমলির মতামত ছাড়া কোনও সাংসারিক সিদ্ধান্তই নেয় না, শুভময় জানেন। হেসে বললেন,—সত্যি, তোকে কত ঝক্কিই না পোয়াতে হয়।

—ঠাট্টা করছ? ঈষৎ অভিমান ফুটল ঝিমলির স্বরে,—আমার জ্বালা তুমি কী বুঝবে? ঘর সামলাও, বাইরে সামলাও.....শুধু ডিউটি ডিউটি ডিউটি। এই যে আজ তোমার কাছে এলাম....লাস্ট উইকে হয়ে ওঠেনি.........আজ এদিকে এসেও না এলে তোমারও তো মুখ হাঁড়ি হত।

শুভময় আহত মুখে বললেন,—আমি তোকে কখনও কিছু বলেছি? রেগুলার ফোনে খবর নিস, আমি তো তাতেই খুশি।

—আমি সব জানি। ছোটমাসি আমায় বলেছে।

—সরমা? কী বলেছে সরমা?

—তুমি ছোটমাসিকে টেলিফোনে বলোনি, কেউ তোমার খবর রাখে না....কবে মরে পড়ে থাকব কেউ টের পাবে না....! ছোটমাসি আমায় একগাদা কথা শুনিয়ে দিল। দাদাকে তো কেউ হাতের কাছে পায় না, সক্কলে তাই...

—আহ্, ছাড় না বাপু। তুই তোর মতো দেখাশুনো করিস, বাবুল তার মতো। ফোন- টোন তো করে।

—বুঝেছি। ছেলের বেলায় সাত খুন মাপ। আর আমি যে প্রাণের টানে সব ফেলে পড়িমরি করে ছুটে আসি, সেটা কারুর নজরে পড়ে না।

—এই দ্যাখো, কী বললাম, কী বুঝলি! আহা, তুইই তো করিস।

অভিমানটাও পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রকাশ করার সুযোগ পেল না ঝিমলি। ফোঁস ফোঁস শ্বাস ফেলছে, আবার সেল্ ফোন। নাক টানতে টানতে যন্ত্র কানে চাপল। নিবিষ্ট ভাবে শুনল ও প্রান্তের কথা। মোবাইল অফ করে ভেজা হাসি উপহার দিল একখানা,—আর কি, শমন এসে গেছে। এক্ষুনি হাজরা গিয়ে এক ক্লায়েন্টের সঙ্গে বসতে হবে।

ব্যস্, শুধু কথাটুকু খসতে যা দেরি, দু' মিনিটের মধ্যে ঝপর ঝপর নেমে গিয়ে, নিজের পয়সায় কেনা মারুতিতে চেপে উবে গেল ঝিমলি।

পায়ে পায়ে বারান্দার ইজিচেয়ারে এসে বসলেন শুভময়। একটা বিকেল ফুরিয়ে যাচ্ছে। আরও একটা দিন খসে গেল জীবন থেকে।

জগন্নাথ এসে ডাকল,—বাবা, আজ বেরোবেন না?

শুভময় উত্তর দিলেন না। হঠাৎই যেন ভার হয়ে আসছে বুকটা। কোথায় যাবেন? কেনই বা যাবেন?

তিন

যাওয়ার মতো জায়গা অবশ্য শুভময়ের একটা হয়েই গেল। খানিকটা আকস্মিক ভাবেই।

মে মাসের শেষের দিকে একদিন একটা ঝড় উঠল সন্ধেবেলা। কালবৈশাখীর মতো। সঙ্গে ঘণ্টাখানেক টানা ঝমঝমাঝম বৃষ্টি। তার পরদিন সকালে পার্কে গিয়ে তন্ময়দের দেখা পেলেন না শুভময়। তার পরদিনও মা-ছেলের দর্শন না পেয়ে শুভময় একটু বুঝি দুশ্চিন্তাতেই পড়ে গেছিলেন, ছেলেটা অসুখ-বিসুখে পড়ল না তো?

পার্ক থেকে সেদিন আর সরাসরি বাড়ি ফেরা হল না। বাড়ির নম্বরটা জানাই ছিল, খুঁজে খুঁজে চলে গেলেন বি ব্লকের বাড়িটায়। ছোট্ট একতলা বাড়ি, সামনে গ্রিল ঘেরা বারান্দা, বেঁটে একটা পাঁচিল আছে বাড়ি ঘিরে, বাড়ি আর পাঁচিলের মাঝে ইতস্তত জংলা ঝোপ।

অর্ধ-পরিচিতের বাড়িতে এভাবে হানা দেওয়া শুভময়ের রুচিতে বাধে। যে ধরনের বৃত্তে তিনি সারা জীবন বিচরণ করেছেন, সেখানে এটা একান্তই সহবতবিরুদ্ধ। তাছাড়া তিনি তেমন মজলিসি মানুষও নন। কোনও কালেই তাঁর তেমন বন্ধুবান্ধব ছিল না, খানিকটা একটেরে ভাবে জীবনটা কেটেছে তাঁর। অন্যের প্রাইভেসিতে নাক গলাতে তিনি অত্যন্ত সংকুচিত বোধ করেন।

তবু সংস্কার আর দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে শুভময় হাত রেখেছিলেন কলিংবেলে, ওই তন্ময়েরই টানে।

মালবিকাই বেরিয়ে এসেছিল। শুভময়কে দেখে অবাক হয়েছে খুব,—একি, আপনি!

শুভময়ের মুখে অপ্রস্তুত হাসি,—আর বলবেন না, সেদিন অফিস থেকে ফিরতে গিয়ে যা ভিজলাম......পরশু সারাটা দিন তো মাথাই তুলতে পারিনি। জোর জ্বর এসে গেছিল।

—ও, তাই বলো। তন্ময় ভালো আছে তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। বলেই মালবিকার খেয়াল হয়েছে শুভময়কে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখাটা শোভন হচ্ছে না। শশব্যস্ত মুখে বলল,—আসুন, ভেতরে আসুন।

শুভময় সংকুচিত ভাবে বললেন,—না না, ঠিক আছে। জাস্ট জানতে এসেছিলাম ছেলেটার....

—আসুন না ভেতরে। দেখে যান তার কাণ্ডখানা। দুদিন ধরে সকালে বেরোনো হচ্ছে না বলে বাবুর কী গোঁসা। আজ তো রাগ করে বিছানা ছেড়েই উঠছে না, গোঁজ মেরে পড়ে আছে।

খানিকটা আড়ষ্টভাবেই মালবিকার পিছু পিছু ঘরে ঢুকেছিলেন শুভময়। বাইরের ঘর- টরের বালাই নেই, প্রথম ঘরটিই শোওয়ার ঘর। মাঝারি সাইজের। ঘরে আসবাবপত্রও তেমন নেই বিশেষ। খাট, আয়না বসানো আলমারি, খান তিন-চার বেতের মোড়া, আর একখানা টেবিল, ব্যস। ডবলবেড খাটে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে তন্ময়, দেওয়ালের দিকে মুখ।

মালবিকা চাপা স্বরে বলল,—ডাকুন, ডাকুন ওকে। খুব অবাক হবে।

শুভময়ের গমগমে গলা বেজে উঠল,—বন্ধু?

চমকে মুখ ঘুরিয়েছে তন্ময়। খুশিতে জ্বলে উঠল চোখ। উল্লসিত স্বরে বলে উঠল,—তোতোতোতো..............

—এখনও শুয়ে কেন? ওঠো। সকাল হয়ে গেছে না!

আঙুল তুলে মাকে দেখাল তন্ময়। ক্ষুব্ধ গলায় নালিশ জানাল,—ব্যাব্যাব্যাব্যা....

—দেখছেন তো, আমার ওপর কেমন চোটপাট করছে।.............বোঝাই কী করে, শরীরে জুত পাচ্ছি না। মালবিকা একখানা মোড়া এগিয়ে দিল শুভময়কে। নিজেও বসেছে খাটের এক কোণে,—আজ একবার ভেবেছিলাম সুমতির সঙ্গে পাঠিয়ে দিই। বেচারা সারাদিন তো বদ্ধ ঘরে থাকে, ওইটুকুই যা ওর বাইরের পৃথিবীতে যাওয়া।

—দিলেই পারতে।

—ভরসা পেলাম না। এতটা রাস্তা ওকে টেনে টেনে নিয়ে যাওয়া.....। ঘরে সামলানো এক জিনিস, রাস্তায় কোথায় কী ঘটে যাবে......। কথা বলতে বলতে ছেলের দিকে ঝুকল মালবিকা। বলল,—ওঠো, তোমার বন্ধুর সঙ্গে গপ্পো করো। তোমার খেলনাগুলো দেখাও। বই-টই দেখাও।

ছেলেকে তুলে বসিয়ে দিয়েছে মালবিকা। খাটের ওপর রঙিন ছবির বই আর প্লাস্টিকের জীবজন্তু ছড়িয়ে আছে। দু' হাত ঝাপটে শুভময়কে ডাকল তন্ময়,—এয়ো, এয়ো।

মালবিকা বলল,—আপনি সামনে এসে বসুন না। জিজ্ঞেস করুন কোন্‌টা কী অ্যানিম্যাল, বলে দেবে।.........আমি ততক্ষণে একটু চা করে আনি।

শুভময় হাঁ হাঁ করে উঠলেন,—থাক না। তোমার শরীর ভালো নেই..........

—দু' কাপ চা করতে কী এমন কষ্ট! আমি নিজেও তো খাব। আপনার লিকার? না দুধ দিয়ে?

—প্লেন লিকার। চিনি কম।

পরদা সরিয়ে মালবিকা ভেতরে যেতেই তন্ময়ের সঙ্গে খেলায় মেতে উঠলেন শুভময়। বাঘের ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করেন, এটা কী? তন্ময় একগাল হেসে বলে, বাআআ। সিংহ দেখিয়ে বলে, সিইইই। ঈগলের ছবি দেখে ডানা ঝাপটানোর ভঙ্গিতে নাড়ায় দু' হাত। জন্তু জানোয়ার দেখে ভয় পাওয়ার ভান করছেন শুভময়, বেজায় আনন্দ পাচ্ছে ছেলেটা, হাততালি দিয়ে উঠছে।

শুভময়েরও বেশ মজা লাগছিল। তাঁর নিজের নাতি-নাতনি আছে, তারাও বাড়িতে এলে নানা ধরনের ছেলেমানুষি খুনসুটি করেন, কিন্তু সেটা আর এটা যেন এক নয়। তন্ময়ের সমস্ত খুশিটাই তাঁকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে, এই ভাবনাটাই যেন একটা অন্য ধরনের তৃপ্তি দিচ্ছিল শুভময়কে। কবেই বা পুচকুন-টুকটুকরা শুধু তাঁরই পথ চেয়ে থাকে? বরং বলা যায় তাদের অজস্র বিনোদনের উপকরণের মধ্যে তিনিও একটা উপকরণ মাত্র। আর তাও তো নেহাতই উপেক্ষিত, প্রায় একটা ঝটতি-পড়তি খেলনা। ন'মাসে ছ'মাসে কাছে পেলে যাকে মনে পড়ে, আবার দূরে গেলে ভুলেও যায়। শুধু শুভময়কে পেয়ে এত উচ্ছ্বসিত কি কখনও হয়েছে পুচকুন-টুকটুক?

আর একটা কারণেও কৌতুক বোধ করছিলেন শুভময়। তাঁর মতো একজন প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, রীতিমতো সম্ভ্রান্ত মানুষ হঠাৎ এক স্বল্প পরিচিত বাড়িতে এসে, সম্পূর্ণ অচেনা পরিবেশে গুছিয়ে বসে, দিব্যি কেমন এক জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলের সঙ্গে অবলীলায় প্লাস্টিকের বাঘ-সিংহ নিয়ে খেলায় মেতেছেন .... এ দৃশ্য পরমা যদি ওপার থেকে দেখে, নির্ঘাৎ ভিরমি খাবে। শুভময়ের নিজের কাছেও নিজের এই নতুন ভূমিকাটি কি ভারী চকমপ্রদ নয়?

মালবিকা চা এনেছে। কাপ-প্লেট শুভময়ের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল,—আপনাদের খুব জমেছে দেখছি! বাবুর মুখেও দেখি হাসি আর ধরে না!

শুভময় লাজুক হাসলেন। মনে মনে বললেন, ওই হাসিটুকুর জন্যই তো ছুটতে ছুটতে আসা।

মালবিকা চায়ে চুমুক দিতে দিতে আপন মনে বলল,—কী যে সেদিন মাথায় ভূত চাপল! ওই জোর বৃষ্টি, কোথায় বাস থেকে নেমে কোনও একটা শেড-টেডের নীচে দাঁড়াব, তা নয়........হঠাৎ মনে হল, এইটুকু তো পথ, গরমের দিনে দিব্যি ভিজতে ভিজতে চলে যাই.....কতকাল বৃষ্টিতে ভিজিনি.......রাত্তিরে যে অমন বিশ্রী জ্বর এসে যাবে কে জানত!

শুভময় মৃদু হাসলেন—বৃষ্টিতে ভিজতে তোমার বুঝি খুব ভালো লাগে?

—লাগে না আবার! একসময়ে কী নেশাই যে ছিল! মালবিকার মুখমণ্ডলে কৈশোরের আভা ফুটল,—স্কুল থেকে ফেরার সময়ে তো ইচ্ছে করে ভিজতাম। মা'র কাছে তখন কম মার খেয়েছি!

—হুম, বুঝলাম।

—কী বুঝলেন?

—তুমি খুব দুষ্টু মেয়ে ছিলে।

—হুঁ।

চুপ করে গেল মালবিকা। শুভময়ের মনে হল মালবিকা যেন একটা ছোট্ট শ্বাস লুকোল। একটু যেন দূরমনা। তিনি কোনও বেফাঁস কথা বলে ফেলেছেন কি? নাকি মেয়েটার কোনও স্মৃতি তাকে নাড়া দিয়ে গেল? তুচ্ছ কথাতেও স্মৃতি যাদের আলোড়িত করে, বর্তমান তাদের সুখের নয়, শুভময় জানেন।

কথা ঘোরানোর জন্য শুভময় বললেন,—ডাক্তার-টাক্তার দেখিয়েছিলে?

মালবিকা শুকনো হাসল,—এই জ্বরে আর ডাক্তার কি দেখাব! সুমতি কয়েকটা ট্যাবলেট এনে দিয়েছিল, তাতেই......

—তোমার সুমতিকে দেখছি না তো? সে কোথায়?

—বাজার গেছে। মালবিকা ঈষৎ চঞ্চল সহসা,—দেখুন তো আক্কেল, কখন গেছে......... দুধটা ধরবে, আর বাজারটা আনবে.....এদিকে আমায় নটার মধ্যে বেরোতে হবে.......

—তুমি আজ অফিস যাবে নাকি?

—যাই। বছরের ছটা মাসও পুরল না, এর মধ্যে আটখানা সি-এল চলে গেছে। এর পর তো আর্নড লিভে হাত দিতে হবে।

—তুমি আছ কোথায়? গভর্নমেন্টে?

—না। ব্যাংকে। ইউ-বি-আই।

—কোন ব্রাঞ্চে আছ?

—থিয়েটার রোড।

—যেতে-আসতে তো তাহলে অনেকটা সময় লাগে?

—আগে তো আরও দূরে ছিলাম। সেই আমহার্স্ট স্ট্রিট ব্রাঞ্চে। বলে কয়ে ম্যানেজ করে তাও খানিকটা সরে এসেছি।

—ও।

মালবিকার সঙ্গে সেদিন আর খুব বেশি কথা হয়নি, সুমতি বাজার থেকে ফেরার পর পরই শুভময় উঠে পড়েছিলেন। মেয়েটা যখন অফিস বেরোবে বলছে, তখন তো আর বসা সমীচীনও নয়।

তবে তারপর থেকে ও বাড়িতে যাওয়াটা যেন রুটিন হয়ে গেল। সকালে বাড়ি অবধি তন্ময়কে এগিয়ে দিলেও তখন অবশ্য ঢোকেন না বড় একটা, ওই সময়ে মালবিকা তাড়াহুড়োর মধ্যে থাকে, শুভময় যান বিকেলে। তন্ময়ের সঙ্গে অর্থহীন গল্প-খেলায় মেতে থাকতে থাকতে সময়ের মনে সময় কেটে যায়। অফিস থেকে

শ্রান্ত হয়ে ফেরে মালবিকা, তার সঙ্গেও কথা বলেন এতাল-বেতাল। রাস্তায় কেমন জ্যাম ছিল, অফিসে কী অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে, ভয়ংকর গরমে প্রাণ কতটা ওষ্ঠাগত, এরকম আরও অজস্র হাবিজাবি। মায়ের সঙ্গে বেশি গল্প করলে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য সশব্দ বিক্ষোভ জানায় তন্ময়। আবার তন্ময়কে নিয়ে শুধু মেতে থাকলে মালবিকা ঘুরঘুর করে কথা বলার জন্য, এও টের পান শুভময়। আহা, সারাদিন পর বাড়ি ফিরে তারও তো একটু গল্পগাছা করতে সাধ যায়।

ভালো লাগে শুভময়ের। মা-ছেলে দুজনের কাছেই তাঁর যে একটা বিশেষ মূল্য তৈরি হয়েছে, এ কি কম প্রাপ্তি? তিনি যে জীবনের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে থাকা একজন স্বজন পরিত্যক্ত বিপত্নীক, এই বিচ্ছিরি সত্যিটা যেন মন থেকে মুছে যায়। কয়েক ঘণ্টার জন্য হলেও।

মাসখানেকের মধ্যে মালবিকার সম্পর্কে অনেক কথাই জেনে গেলেন শুভময়। যেমন, মালবিকার বাবা মারা গেছেন বছর সাতেক আগে। ক্যানসারে । হঠাৎই অসুখটা ধরা পড়েছিল, দুটো কেমো নেওয়ার পরই দুম করে হার্টফেল করলেন। মালবিকার মা এখন থাকেন রিজেন্ট পার্কে। ছেলে, ছেলের বউ-এর সংসারে। মালবিকার মামাতো দিদি গোল্ডেন পার্কের এই বাড়ির পুরোটাই দিয়ে গিয়েছিল বোনকে। বসবাসের জন্যে। কিন্তু মালবিকা একটা মাত্র ঘর আর খাওয়ার জায়গাটুকু নিজের জন্যে রেখে বাকি দুটো ঘর তালা বন্ধ রেখেছে। থাকতে দিয়েছে বলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জায়গা সে ব্যবহার করবে কেন? যেটুকু জায়গাতে সে আছে তাতেই তো তার দিব্যি কুলিয়ে যায়!

শুনে শুভময় মুগ্ধ হয়েছিলেন। ওই মানসিকতাটুকু থেকে মালবিকাকে যেন অনেকটা চিনে ফেলা যায়!

শুধু দু' চারটে প্রশ্ন শুভময়ের মনে রয়েই গেছে। মালবিকা কি বিধবা? কী ভাবে মারা গিয়েছিল মালবিকার স্বামী? কিন্তু স্বামী মৃত হলে একটা অন্তত ছবি তো ঘরে থাকবে। তাও তো নেই! ভুলেও কখনও তন্ময়ের বাবার কথা তোলে না মালবিকা। তবে কি সে ডিভোর্সি? হয়তো তাই। ওই রকম ছেলে নিয়ে মা-দাদার কাছে না থেকে একা একা এখানেই বা আছে কেন?

মনে মনে কৌতূহল জাগলেও কিছুতেই ওসব কথা মালবিকাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন না শুভময়। করবেনও না। রুচিতে বাধবে। গায়ে পড়ে কারুর ব্যক্তিগত জীবনে উঁকি দিতে যাওয়া কি অশালীন কাজ নয়? নিজের ছেলেমেয়ের সংসারেই চোখ ফেলতে তিনি সংকোচ বোধ করেন, আর এ তো একান্তই বাইরের লোক। তাছাড়া তিনি জেনে করবেনটাই বা কী?

তার চেয়ে এই তো বেশ। হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়া এই ভালো লাগাটাকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করা। এইটুকুই তো ভালো। নয় কি?

চার

দুপুর থেকে শুভময়ের মেজাজটা একটু খাট্টা আজ। খেয়েদেয়ে উঠে ঘুমোলে গা'টা কেমন ম্যাজম্যাজ করে, ঘুম তাড়াতে তাই তিন-চার বার কম্পিউটার খুলে বসেছিলেন। অন্তর্জালে প্রবেশ করতেই ই-মেল বক্সে ছেলের চিঠি। বাবুল ফ্ল্যাট কিনছে পুনেতে। বড় ফ্ল্যাট। দাম প্রায় তিরিশ লাখ মতো পড়ছে। ব্যাংক থেকেই নাকি লোন নেবে, তবে প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলাতে বাবার কাছে টাকা চেয়েছে কিছু। লাখ খানেক মতো।

টাকা শুভময় দিতেই পারেন। ব্যাংকে তাঁর যা সঞ্চয় আছে সেখান থেকে এক লাখ চলে গেলে তিনি ভিখিরি হয়ে যাবেন না। কিন্তু খারাপ লাগছে অন্য কারণে। বাবুল তাহলে পাকাপাকিভাবে কলকাতা না ফেরার সিদ্ধান্তটা নিয়ে নিল? এই যে তবে গোল্ডেন পার্কের জমিটা পরমা নিজে পছন্দ করে কিনলেন, নামী আর্কিটেক্টকে দিয়ে বাড়ির ডিজাইন করানো হল, তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে মিলে বাড়িটাকে তিলে তিলে গড়লেন, এর তাহলে কী ভবিষ্যত? ঝিমলি তো এখন থেকেই চেঁচায়, এই ধ্যাধ্ধেড়ে গোবিন্দপুরে মানুষ থাকে না! অর্থাৎ ঝিমলিরও এ বাড়ির প্রতি কোনও মায়া নেই। বাবুলও যদি না ফেরে তাহলে এ বাড়ি তো খরচার খাতায়!

তাঁর মৃত্যুর পর কী ঘটবে, দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন শুভময়। শ্মশানে বাবাকে পুড়িয়ে এসেই এ বাড়ি বিক্রির বন্দোবস্ত করে ফেলবে ভাই-বোন। বেশি টাকা পাওয়ার আশায় হয়তো কোনও অমার্জিত ব্যবসায়ীকে বেচবে শুভময়-পরমার এই 'নিরালা'। কালার শেড ঘেঁটে ঘেঁটে পছন্দ করা পরমার মাখনরঙ দেওয়ালগুলোকে তারা হয়তো ক্যাটকেটে সবুজ করে নেবে, কিংবা কুৎসিত গোলাপি। যত্ন করে বানানো বাগানখানা তছনছ হয়ে যাবে। হয়তো বা অতটা ফাঁকা পড়ে থাকা জমি তারা রাখবেই না, সেখানে ইঁট-কাঠের খাঁচা বানিয়ে ফেলবে। এই যে এখনও প্রতিটি ঘরের আনাচে-কানাচে পরমার স্মৃতি, যা প্রতি মুহূর্তে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখেন শুভময়, তাঁব মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোরও আর অস্তিত্ব থাকবে না কোথাও। কারও কাছেই।

পুরনো কথা মনে পড়ছিল শুভময়ের। বাবুলটা ছোটবেলা থেকেই বড় বেশি গোছানো টাইপের। হিসেবী। সেন্টিমেন্ট-ফেন্টিমেন্টের ধার ধারে না বিশেষ।

ফিলিং-টিলিংগুলোও কম। শুভময় অফিসট্যুরে পাঞ্চেত গেছেন, পরমা জ্বরে কাহিল, মার শরীর খারাপ জানা সত্ত্বেও দুম করে আই-আই-টির বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে নেমন্তন্ন করে বসল বাবুল। নিজে রান্নাবান্না করতে না পারো হোটেল থেকে এনে খাওয়াও। পরমা মাথার যন্ত্রণায় কোঁকাচ্ছেন, ঝিমলির সামনে সেমিস্টার এগ্‌জাম্, বাবুলের তাতে ভ্রূক্ষেপও নেই, গানবাজনা চালিয়ে আপ্যায়ন করছে বন্ধুদের। বাড়িতে একটা পুরনো দামী ক্যামেরা ছিল। রোলিফ্লেক্স। শুভময়ের বাবার শখ করে কেনা। তেমন একটা ব্যবহার আর হত না বটে, তবে শুভময়ের শৈশবের স্পর্শ লেগে ছিল ক্যামেরাটার সর্বাঙ্গে। বলা নেই, কওয়া নেই, বাবুল সোজা গিয়ে বেচে দিয়ে এল অক্‌শন শপে। কী, না ফালতু ফালতু ওই গোবদা মাল পুষে কী লাভ, ক্যামেরাটা দিয়ে যা টাকা পেয়েছি, তার সঙ্গে আরও কিছু দাও, একটা ভালো পেনট্যাক্সের এস-এল-আর কিনে নিই!

সত্যি, ঝিমলি ঠিকই বলে। নিজের সুখ আর নিজের বৃত্তের বাইরে বাবুল আর কিচ্ছুটি বোঝে! নইলে বিয়ের পর থেকেই বাবা-মাকে ফেলে রেখে বাইরে চাকরি করতে যাওয়ার জন্য ছটফটানি শুরু করে? পরমা বলত, শ্বেতা নাকি কান ভাঙিয়েছে তার ছেলের। মোটেই তা নয়। ইচ্ছে নিশ্চয়ই বাবুলের মধ্যেই পুরো মাত্রায় ছিল, শ্বেতা বড় জোর ইন্ধন জুগিয়েছে। বদলানোর প্রবণতা না থাকলে শুধু মাত্র প্ররোচনায় কি মানসিকতা বদলায়? হিসেব বাবুলের ছকাই ছিল। বুড়োবুড়ি যদ্দিন টিকে আছে, দূরে গিয়ে নিজের মতো করে থাকো, হাত-পা ছড়িয়ে, খোলামেলা ভাবে জীবন কাটাও। আজ হোক কাল হোক বাপ মা তো ঝরবেই, বাপের গড়া প্রাসাদটাও থাকবে, তখন তার বখরা নেওয়াই বা ঠেকায় কে?

শুভময়ের বিরক্তিটা বদলে যাচ্ছিল অভিমানে। ইজিচেয়ারে শরীর ছেড়ে দিয়ে শুভময় বড়সড় শ্বাস ফেললেন একটা। পুবের বারান্দায় ছায়া এখন। আজ সকাল থেকে আকাশটাও ছেয়ে আছে মেঘে। বর্ষা পুরোদমে নামেনি বটে, তবে তার প্রস্তুতি খানিকটা যেন শীতল করে দিয়েছে পৃথিবীকে। সামনের দেবদারু গাছে পাখি ডেকে উঠল একটা। ডাকছে, থামছে, আবার ডাকছে। ওই পাখির ডাক, ওই মেঘছায়া, শুভময়ের নির্জন অপরাহ্ণ-টাকে যেন আরও বেশি মনমরা করে দিচ্ছিল। উঠে ঘর থেকে সিগারেট-লাইটার নিয়ে এলেন। ধরাতে ইচ্ছে করল না, ফাঁকা চোখে তাকিয়ে আছেন দেবদারু গাছটার দিকে। স্নিগ্ধ সবুজে যদি বুকটা একটু জুড়োয়।

জগন্নাথ বৈকালিক চা নিয়ে এল। বাহারি ট্রেতে সুগারপট টিপট সব সাজিয়ে এনেছে। পরমার শেখানো কায়দায়। ইজিচেয়ারের পাশে মেহগনি কাঠের ছোট্ট

টুল টেনে এনে তার ওপরে রাখল ট্রে। কাপে চা ঢালতে ঢালতে বলল,—আজ কি বেরোবেন?

শুভময় সচকিত হলেন। আরে তাই তো, বিকেল তো এসে গেল! সামান্য সোজা হয়ে বসে বললেন,—হুঁ। উঠব এবার।

—আকাশ দেখেছেন? যখন তখন জল ঝরাবে।

—তো?

—বেরোলে ছাতা নেবেন সঙ্গে।

পরমার কাছ থেকে গার্জেনগিরি করাটাও ভালো রপ্ত করে নিয়েছে জগন্নাথ। কিংবা বলা যায় পরমা যাওয়ার পর পরমার কাজগুলো করা তার দায়িত্ব বলে ধরে নিয়েছে। পরমার মতো করেই দেখভাল করার চেষ্টা করে। নিজের সাধ্যমতো। কখন শুভময়ের কী প্রয়োজন, সব যেন জগন্নাথের মুখস্থ। শুভময়ের পছন্দ-অপছন্দগুলোও। তিনি পোস্ত খেতে ভালোবাসেন বলে জগন্নাথ সপ্তাহে অন্তত তিন দিন পোস্ত রাঁধবেই। চালচলনে শুভময় যতই সাহেব হোন না কেন, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তিনি খাঁটি বাঙালি, তাঁর জন্য লাউ মোচা থোড় এঁচোড়ও ঠিক মনে করে করে আনে বাজার থেকে। কোনও দিন শুভময় কম খেলে উদ্বিগ্ন হয়, বার বার জিজ্ঞেস করে বাবার শরীর গড়বড় করল কিনা। তাঁর জামাকাপড় কেচেকুচে পরিপাটি করে ইস্ত্রি করে রাখা, বিছানা ফিটফাট রাখা, হাতের কাছে যখন যা দরকার জুগিয়ে যাওয়া, সবেতেই সে ভারী নিখুঁত।

শুভময় আপন মনে হাসলেন একটু। নাহ্, এরকম একনিষ্ঠ সেবক সত্যিই বিরল। মায়াও হয় ছেলেটার ওপর। বছর চোদ্দ এ বাড়িতে থেকে এখন জগন্নাথ এ সংসারেরই একজন, তবু তার একটা ঘরবাড়ি তো আছে, মা-বাপ আছে সেখানে, ভাই-বোন আছে। পরমা থাকতে বছরে তাও দু' বার দেশে যেত জগন্নাথ, গত আড়াই বছরে তো প্রায় ছুটিই পেল না বেচারা। একবারই মাত্র ঘুরে এসেছিল দিন সাতেকের জন্য। শুধুই কি মাস গেলে কটা টাকা পায় বলে তাঁকে ঘিরে থাকে জগন্নাথ?

আবার একটা শ্বাস পড়ল শুভময়ের। জগতে আপন-পর বোঝাটা সত্যিই বড় দায়। পরের ছেলে আপন হয়ে ওঠে, আপন স্বেচ্ছায় পর হয়ে যায়।

শুভময় জোর করে মাথা ঝাঁকালেন। ধুৎ, যত্ত সব উল্টোপাল্টা ভাবনা। এসব কি বুড়োমির লক্ষণ? ছেলেমেয়ে মানুষ হয়ে গেলে যে যার বৃত্তে বিচরণ করবে, এটাই তো স্বাভাবিক। এ নিয়ে আফশোস করাটা মূর্খামি। স্বার্থপরতা। তিনি কি নিজের জীবনটা নিজের মতো করে উপভোগ করেননি?

চায়ে চুমুক দিতে দিতে শুভময় সিগারেটটা ধরিয়ে ফেললেন। জগন্নাথ পাশে দাঁড়িয়ে, খানিকটা চনমনে স্বরে তাকে জিজ্ঞেস করলেন,—বর্ষাটা এবার কেমন ছিড়িক ছিড়িক করছে না?

—হ্যাঁ। এমন চললে চাষের বারোটা।

—চাষবাস নিয়ে তোর খুব মাথাব্যথা আছে বুঝি?

জগন্নাথ মাথা চুলকোল। হাসছে।

—এ বছরও দেশে যাবি না? চাষের সময়ে?

—কী হবে গিয়ে? দাদারাই তো সবকিছু দেখে। বলতে বলতে কী যেন মনে পড়ে গেল জগন্নাথের। বলল,—বিজয় কিন্তু সামনের মাসের গোড়ায় দেশে যাবে। আপনাকে বলতে বলছিল।

—ক'দিনের জন্য?

—বলছে তো দিন দশেক। আমার তো মনে হয় এক মাসের আগে ফিরবে না।

—সর্বনাশ, আমার বাগানের তাহলে কী হবে? এক মাসে তো আগাছায় ভরে যাবে।

—আমি তো আপনাকে আগেই বলেছিলাম বাবা, কাছেপিঠের কাউকে রাখুন। বিজয় এসে গোলাপগাছ নিয়ে লেকচার ঝাড়ল, আপনিও গলে গেলেন। আগের শীতে কটা ভালো গোলাপ ফুটিয়েছে ও? ভালো করে কলম পর্যন্ত ছাঁটতে জানে না...অর্ধেক দিন চুল্লু খেয়ে বাগানে কাজ করতে আসে।

বিজয়ের সঙ্গে একদমই বনে না জগন্নাথের। মাঝেমাঝেই তর্কবিতর্ক হয়। শুভময় হেসে ফেললেন,—ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুই একটা ভালো লোক দ্যাখ।

—বিজয়কে তাহলে বলে দিই?

—আহ্, তাড়াহুড়োর কী আছে? তুই আন্ না লোক। কথাটথা বলি।

জগন্নাথ চায়ের ট্রে নিয়ে চলে এল। ঘরে এসে গায়ে পাঞ্জাবিটা চড়িয়ে নিলেন শুভময়। কম্পিউটারটা অফ্ করা হয়নি, স্ক্রিনসেভার দুলছে পরদায়। একরাশ রঙিন বল উল্কার মতো ছুটে এসে মিলিয়ে যাচ্ছে। ফিরে আসছে আবার। স্বপ্নের মতো। চেয়ারে বসে যন্ত্রটাকে অফ্ করলেন শুভময়।

জগন্নাথ ছাতা এনেছে। হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল,—আজ ইলেক্‌ট্রিকের বিল এসেছে।

—কত এল?

—পাঁচশো একান্ন।

—সে কী রে, গত মাসে তো পাঁচশো দুই এসেছিল!

—ও ব্যাটারা চোর আছে। উল্টোপাল্টা মিটার রিডিং বসিয়ে দেয়।

—নাহ্, ঠিকই আছে হয়তো। এ মাসে তো ওয়াশিং মেশিন বেশি চালিয়েছিস। পরদা-ফরদা কাচলি, সোফাকভার ধোলাই হল...। কবে লাস্ট ডেট?

—দশ তারিখ। মানে বুধবার।

—সোমবার গিয়ে দিয়ে আসিস। ভুলিস না।

—আপনি আজ ফিরছেন কখন?

—যেমন ফিরি রোজ। সাড়ে সাতটা আটটা।

কব্জিতে রিস্টওয়াচ বেঁধে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ধীর পায়ে নেমে এলেন শুভময়। পথে নেমে ঘাড় তুলে একবার দেখলেন আকাশটাকে। উঁহু, এখনই তেমন বড়সড় কিছু নামবে বলে মনে হয় না।

তন্ময়দের গেটের সামনে এসে শুভময় থমকে গেলেন সামান্য। ভেতরে যেন এক অচেনা বামাকণ্ঠ? সামান্য দ্বিধা নিয়ে টিপলেন বেলটা।

সুমতি বেরিয়ে এল। শুভময়কে দেখেই একগাল হাসি,—অনেক দিন বাঁচবেন মেসোমশাই। এক্ষুনি আপনার কথা হচ্ছিল। মাসিমার সঙ্গে।

শুভময় থতমত মুখে বললেন,—কে মাসিমা?

—দিদির মা। দুপুরে এসেছেন।

—আমি তাহলে আজ বরং যাই।

—ওমা, তা কেন? উনি তো আপনার সঙ্গে আলাপ করার জন্য কখন থেকে মুখিয়ে আছেন।

খানিকটা সংকুচিতভাবে শুভময় ঘরে ঢুকলেন বটে, তবে দু-চার মিনিটের মধ্যে কেটেও গেল জড়তাটা। মন্দিরা বেশ মিশুকে ধরনের মহিলা, সহজেই আলাপ জমিয়ে নিতে পারেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রশ্ন করে করে শুভময়ের নাড়িনক্ষত্র জেনে নিলেন। ছেলে কোথায় চাকরি করে, ছেলের বউ কোনও কাজ করে কিনা, নাতনির কত বয়স, মেয়ে-জামাই কী করে, থাকে কোথায়, নাতি কোন স্কুলে পড়ে...। অচেনা মহিলার সামনে বসে এত কথা বলার অভ্যেস নেই শুভময়ের, তবু আজ কেন যেন ইন্টারভিউটা দিতে মন্দ লাগল না। আসলে বোধহয় এ বাড়ির আবহটাই এরকম, এখানে পা রাখলে শুভময় মুখার্জি যেন অন্য শুভময় হয়ে যান।

বন্ধুকে পেয়ে অভ্যস্ত খুশিতে ঝিকমিক করছে তন্ময়। তাকে মাটিতে বসিয়ে দিয়েছে সুমতি, সামনে খেলনার স্তূপ। পরশু গোল্ডেন পার্কের বড় স্টেশনারি দোকানটা থেকে একটা লাল রঙের খেলনাগাড়ি এনে দিয়েছিলেন শুভময়, মেঝেয়

ঘসে সেটাকে চালাচ্ছে ছেলেটা। গাড়ি গড়িয়ে গেলেই পুলকে আআআ করে ওঠে তন্ময়। শুভময় বা মন্দিরা আবার সেটাকে তার হাতে ফিরিয়ে দেন, তন্ময় আবার চালায় গাড়ি। তার মধ্যেই সুমতি তাকে দুধ-চিঁড়ে খাওয়াতে বসল। দুধ-চিঁড়ের মণ্ডও ঠিক মতো মুখে রাখতে পারছে না তন্ময়, নালে-ঝোলে মিশে খাবার গড়াচ্ছে কষ বেয়ে। সুমতির মুখ মোছানোর ন্যাপকিন দু মিনিটে ভিজে জাব।

মন্দিরা দেখছিলেন তন্ময়কে। হঠাৎই ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলে বললেন,—ছেলেটার জন্য আমার যা ভাবনা হয়! রাতে ভালো করে ঘুমোতে পর্যন্ত পারি না।

শুভময় চুপ করে রইলেন। এ কথার কি কোনও উত্তর হয়?

মন্দিরা ফের বললেন,—মিলু কিন্তু আপনার কথা খুব বলে।

—কী বলে? শুভময় মৃদু হাসলেন,—রোজ রোজ একটা বুড়ো এসে জ্বালায়, তাই তো?

—না না, তা কেন! আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে ও অনেক নিশ্চিন্ত হয়েছে। আপনি বাবুর পেছনে কত সময় দেন, ছেলেটাকে হাসিখুশি রাখেন...

—আমারও সময় কাটে। বোঝেনই তো, অকম্মা মানুষ!

—সে আপনি যাই বলুন, প্রাণের টান আছে বলেই না রোজ আসেন ছুটে ছুটে। মন্দিরা আলগা করে মাথায় আঁচল টানলেন,—সত্যি বলতে কি, আমিও বড় স্বস্তি পেয়েছি। একা মেয়ে...ওই ছেলে নিয়ে কী আতান্তরের মধ্যে থাকে...তাও আপনার মতো একজনকে মাথার ওপর পেয়ে গেল...।

শুভময় হেসে উঠলেন,—আমি কারুর মাথার ওপর নেই। আমার ছেলেমেয়েরাই আমায় আর পাত্তা-টাত্তা দেয় না...

—ও কথা বলবেন না। মিলু আপনাকে ভীষণ শ্রদ্ধা করে। আমি তো বলি, ঈশ্বর আপনাকে পাঠিয়েছেন।

এ ধরনের স্তুতিতে শুভময় অভ্যস্ত নন। হঠাৎই গায়ে কাঁটা দিল। কী করে মন্দিরাকে তিনি বোঝাবেন, এখানে এসে তিনি যা পান, তার তুলনায় কিছুই তো তাঁকে দিতে হয় না। তাঁকে পেয়ে মালবিকা-তন্ময় বেঁচেছে? না তিনিই মালবিকা-তন্ময়কে পেয়ে বর্তে গেছেন?

তন্ময়ের খাওয়া শেষ। মন্দিরা সুমতিকে বললেন,—যা তো, আমাদের জন্য দু'কাপ চা করে আন্ তো।

সুমতি বাটি নিয়ে চলে গেল। আহারের পর আবার খাওয়ায় পেয়েছে তন্ময়কে। গাড়িটা চাইছে—অঅঅঅঅ...

খেলনা গাড়িখানা তন্ময়ের দিকে গড়িয়ে দিয়ে শুভময় বললেন,—আপনি তো টালিগঞ্জের দিকে থাকেন?

—রিজেন্ট পার্কে।...মিলুর বাড়িটা বড্ড দূরে হয়ে গেছে, ইচ্ছে থাকলেও ঘন ঘন আসা হয় না। ফোন করে বার বার খবর নেব, সে উপায়ও নেই। দুম করে রত্নার এখানকার ফোনটা মেয়ে সারেন্ডার করে দিল। রোজ রোজ কি মিলুর অফিসে ফোন করা যায়? বলুন?

—এ বাড়িতে ফোন ছিল?

—ছিল না আবার! রত্না তো মিলুকে পইপই করে রাখতেও বলেছিল। রাতবিরেতে ডাক্তার-মাক্তার ডাকতেও তো ফোন লাগে।

—বটেই তো। মালবিকা ফোন রাখল না কেন?

—জেদ। গোঁ। একবার যদি জেদ ধরে, তার থেকে ওকে নড়ায় কার সাধ্যি। রত্নাকে সোজা বলে দিল, আমার ভাই অনেক খরচা, ফোনের বিল-টিল দিতে পারব না...তেমন জরুরি দরকার হলে কোথাও একটা থেকে ফোন করে নেব। আপনিই বলুন, এটা কি একটা যুক্তি হল?

শুভময় মনে মনে মানলেন কথাটাকে। তন্ময়ের পিছনে ভালোই খরচা হয় বটে, তারপর এই সুমতিও আছে...এমন একটা প্রতিবন্ধী বাচ্চার দেখভাল করার জন্য সুমতিও নিশ্চয়ই ভালোই পয়সা নেয়...কিন্তু ব্যাংকের মাইনেপত্র তো মন্দ নয়, ওই জরুরি পরিষেবাটির জন্য মাসে তিন-চারশো কি আরও ব্যয় করা যায় না?

মুখে অবশ্য শুভময় অন্য কথা বললেন,—এক কাজ করুন, আমার ফোন নাম্বারটা রেখে দিন। ইচ্ছে হলে রোজ এক দুবার তন্ময়ের খবর নিতে পারবেন।

—তাহলে তো ভালোই হয়। মন্দিরাকে বিগলিত দেখাল। পরক্ষণেই ঈষৎ সাবধানী যেন। সতর্ক স্বরে বললেন,—আপনি কিন্তু মিলুকে এসব বলবেন না।

—কেন?

—আমার ওপর চোটপাট করবে। কেন তুমি একটা মানুষকে রোজ ডিসটার্ব করছ!

—এতে ডিসটার্ব হওয়ার কী আছে! জাস্ট খবরাখবর দেওয়া...

—মেয়ে বুঝলে তো! ও কি একবারও ভাবে আমি ওদের নিয়ে কত দুশ্চিন্তায় থাকি!

শুভময়ের মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল,—তা মেয়ের কাছে এসে থাকলেই তো পারেন।

—ইচ্ছে তো করে! ওদিকেও বাঁধন আছে না! ছেলে ছেলের বউ দুজনে অফিস

বেরিয়ে যায়, দু'দুটো দুরন্ত নাতিকে কে সামলাবে? এই যে আজ কাজের মেয়েটার ওপর ছেড়ে এসেছি ...সারাক্ষণ বুক ঢিপঢিপ করছে, কিছু একটা কাণ্ড না বাধিয়ে বসে। তাছাড়া...

মন্দিরা থেমে গেলেন আচমকাই। শুভময় জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন। একটু যেন ইতস্তত করছেন মন্দিরা। তারপর অকারণে গলা নামিয়ে বললেন,—আপনি এদের কাছের লোক হয়ে গেছেন, আপনার কাছে আর কী সংকোচ! আসলে মিলু চায় না আমি ওর কাছে থাকি।

—সে কী? বিস্ময় চাপতে পারলেন না শুভময়। মুখ থেকে ঠিকরে এল,— কেনওও?

—সে অনেক কথা বলতে হয় তাহলে। মন্দিরা আবার থমকালেন। বোধহয় বলবেন, কি বলবেন না ভেবে নিলেন দু'দণ্ড। সুমতি চা দিতে এসেছিল, তাকে দেখেও বুঝি নিশ্চুপ হয়েছেন। সে অন্দরে ফিরে যাওয়ার পর গলা একেবারে খাদে নামিয়ে বললেন,—সুব্রতর সঙ্গে ছাড়াছাড়ির পর মিলু তো প্রথমে ছেলে নিয়ে ও বাড়িতেই উঠেছিল। ওর দাদা-বউদিও আদর করেই রেখেছিল ওকে। গোল বাধল মিলুর এই ছেলেকে নিয়ে। বললাম না, আমার নাতি দুটো ভারী দুষ্টু...ওরা খুব জ্বালাতন করত বাবুকে। এই ঠেলে ফেলে দিচ্ছে, অ্যাঅ্যা করে ভ্যাংচাচ্ছে, মুখ দিয়ে লাল পড়া দেখে দুয়ো দিচ্ছে...। কোন মায়ের এসব ভালো লাগে বলুন? তা মিথ্যে বলব না, প্রথম প্রথম আমার ছেলে ছেলের বউ নানানভাবে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তাদের ছেলেদুটোকে খুব বকত, মারধোর করত...। আস্তে আস্তে ওরাও কেমন গা-ছাড়া দিয়ে দিল। ভাবনাটা এমন, কেন পাত্তা দিচ্ছ, এসব বাচ্চাদের ব্যাপার, উড়িয়ে দাও না! এই নিয়েই ননদ-ভাজে একদিন লেগে গেল ধুন্ধুমার। এ বলে, তোমরা আমার ছেলেকে টিজ করা উপভোগ করছ...ও বলে, বাচ্চাদের ছেলেমানুষিতে অতই যদি তোমার ছ্যাঁকা লাগে, জরদ্গব ছেলেকে খাঁচায় পুরে রাখো না কেন! আর একান্তই না পোষালে ছেলে নিয়ে ভিন্ন হয়ে যাও!...শুনে তো মিলু রাগে গনগন। ফুটছে। আমার অপরাধ, আমি ঝুপ করে বলে ফেলেছিলাম, তুই কি কোথ্থাও একটু মানিয়ে গুনিয়ে থাকতে পারবি না মিলু! কথাটা বললাম ওকে শান্ত করার জন্য, কিন্তু ও আমাকে উল্টো বুঝল। খরখর করে বলল, আমার বাবার বাড়ি থেকে আমার দাদার বউ আমায় উৎখাত করতে চাইছে, আর তুমি কিনা তাদেরই পক্ষ নিয়ে আমায় পাপোষ হয়ে পড়ে থাকতে বলছ! ব্যস্, তল্পিতল্পা গুটিয়ে ছেলে নিয়ে বাড়ি ভাড়া করে চলে গেল গড়িয়ায়। তারপর তো রত্নাই বিদেশ যাওয়ার আগে ওকে এ বাড়িতে এসে থাকতে

বলল। মন্দিরা সামান্য দম নিয়ে ফের বললেন,—আমার মেয়েটার বড্ড অভিমান। ওই যে একবার আমার মুখ থেকে একটা বেফাঁস কথা বেরিয়ে গেছে...আমি গড়িয়ায় ওর কাছে চলে যেতে চেয়েছিলাম, মিলু কিছুতেই রাজি হল না। ঘুরে ফিরে তার সেই এক কথা, আমি সব্বাইকে চিনে গেছি মা। বুঝে গেছি, বিয়ের পর বাপের বাড়ির চৌকাঠটা আমার জন্য অনেক উঁচু হয়ে গেছে।...তার চেয়ে বরং এই ভালো। তুমি তোমার জায়গায় থাকো। ইচ্ছে হলে এসো, দেখে যেও...। আমার হয়েছে শাঁখের করাত দশা। কাকে ফেলে কাকে রাখি!

মন্দিরার স্বর ভারী হয়ে গেছে। নাক টানছেন। শুভময় নীরব। না, মালবিকার স্বামীরহস্য উন্মোচিত হওয়ার ব্যাপারটা তাঁর মনে আদৌ রেখাপাত করছে না, তিনি ভাবছেন শুধু মালবিকার কথা। মেয়েটার আচরণকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? এটা কি প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ? নাকি এক ধরনের খ্যাপামি? তন্ময়ের ব্যাপারে মালবিকা স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত সংবেদনশীল। এই স্পর্শকাতরতাই কি মালবিকার যাবতীয় দুঃখ-যন্ত্রণার কারণ?

শুভময় বুঝতে পারছিলেন না।

পাঁচ

এতদিনে বর্ষাটা জাঁকিয়ে এসেছে। সারাদিন ঝুলবর্ণ হয়ে থাকে আকাশ, যখন তখন নেমে আসে মুষলধারায়। আর একবার নামল তো থামার নামটি নেই, ঝরছে তো ঝরছেই। জলবন্দি হয়ে কলকাতার প্রায় নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। গোল্ডেন পার্কে অবশ্য জল জমে না তেমন, তবে সর্বত্র প্যাচপ্যাচ করছে কাদা। শুভময়ের মর্নিংওয়াকেরও দফারফা। তন্ময়ই যদি না আসতে পারে, কেন তিনি বর্ষাতি চাপিয়ে বেরোবেন ভোরবেলায়?

হ্যাঁ, রেনকোট। এই বৃষ্টির যা বহর, থোড়াই ছাতাকে মানবে!

আজ বেলার দিকে আকাশ ফর্সা হয়েছিল কিছুটা, একবার বোধহয় উঁকিও দিয়েছিল সূর্য। শুভময় জয় মা বলে বেরিয়ে পড়েছিলেন। গিয়েছিলেন ব্যাংকে। টাকাপয়সা তুলে, দু-একটা সাংসারিক জিনিসপত্র কিনে ফেরার ইচ্ছে ছিল। হল না, ব্যাংকেই আটকে গেলেন। আবার হানা দিয়েছেন পর্জন্যদেব।

ঠায় এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার পর বৃষ্টি ধরল। ব্যাংক থেকে শুভময়ের বাড়ি হাঁটাপথে মাত্র মিনিট দশেক, তবে আজ ব্যাংকের বাইরে এসে শুভময় রিক্‌শা নিলেন একটা। সিটের সামনে প্লাস্টিকের পরদাটাও নামিয়ে দিলেন। টিপটিপ ঝরছে এখনও, হাওয়াটাও বড্ড স্যাঁতসেঁতে, এ সময়ে অসাবধানী হয়ে বেমক্কা জ্বরে কাবু হয়ে পড়া কোনও কাজের কথা নয়। নিজেকে তিনি এখনও যত তরুণই ভাবুন না কেন, অস্থিমজ্জায় ঘুণ তো ধরেছেই।

রিকশা থেকে নেমে ভাড়া মেটাতে গিয়ে চমক। বাড়ির সামনে সাদা মারুতি। হঠাৎ ঝিমলি এল এই বর্ষায়?

বাবাকে দেখামাত্র ঝিমলি রিনরিন করে উঠল,—ব্যাপার কী? কখন বেরিয়েছ, ফেরার নামটি নেই?

—আর কি, যা এক পশলা ঢালল! তুই কতক্ষণ?

—হাফ অ্যান্ড আওয়ার হয়ে গেছে।...সাইটে এসেছিলাম। কাম বন্‌ধ। ঝিমলি হাত ওল্টাল,—চলো চলো, খেতে বসে যাও। তোমার সঙ্গে আমিও আজ লাঞ্চ করব।

—সত্যি?

—নয় তো কী! খাব বলেই তো তোমার জন্য ওয়েট করছি।

শুভময় দারুণ খুশি হলেন। ক্ষিদেতে পেট চুঁইচুঁই তো করছেই, উপরি পাওনা আপনজনের সঙ্গে বসে আহার। এমন সৌভাগ্য ক'দিন তাঁর কপালে জোটে! পলকের জন্য মনে হল আজ স্নান হয়নি। চট করে সেরে আসবেন কি? পরক্ষণে মত বদলালেন। যাক গে, বর্ষায় একদিন নিত্যকর্মটি নয় বাদই গেল।

জগন্নাথ টেবিল সাজিয়ে ফেলেছে। আজ সরল মেনু। ফ্রিজে ভেটকি মাছ রাখা ছিল, সরষে দিয়ে ঝাল করেছে, সঙ্গে কলাই-এর ডাল, আলুপোস্ত, আর শেষপাতের জন্য চাটনি।

ডাইনিং টেবিলে এসে শুভময় হতবাক। সামনের চেয়ারে ঝিমলি বসে আছে বটে, কিন্তু প্লেট নেয়নি।

শুভময় ভুরু কুঁচকে বললেন,—তোর থালা কোথায়?

—আসছে আসছে, আমারটা আসছে। অর্ডার প্লেস্ করে দিয়েছি।

বলতে না বলতে জগন্নাথ হাজির। এক হাতে কাচের প্লেট, অন্য হাতে কাচের বাটি। স্যালাড আর টক দই।

শুভময় ভাত মাখতে ভুলে গেলেন,—তুই এই খাবি?

—দুপুরে এই তো ভালো বাবা। ফালতু ফালতু ক্যালরি নিয়ে কী লাভ? এতে বরং শরীরটাও ঝরঝরে থাকবে।

—ছাই থাকবে। বেশি ডায়েটিং করতে গিয়ে অ্যানিমিক হয়ে যাবি। চড়চড় করে প্রেশার নেমে যাবে।

—ওসব তোমাদের ভুল কনসেপ্শান। শরীরের জন্য একবেলা কার্বোহাইড্রেট নেওয়াই যথেষ্ট। রাতে তো ভাত-রুটি কিছু খাবই। এ বেলা মিছিমিছি ওসব গিলে বডিটাকে ভারী করব কেন?

—কী জানি বাপু, তোদের ব্যাপার-স্যাপার আমি বুঝি না। গায়ে একটু গত্তি লাগলে কী এমন দোষ হয়? তোর মা তো দু'বেলাই ভাত খেত, কী এমন মোটা ছিল সে?

বাবার কথা গায়েই মাখল না ঝিমলি। কচর কচর শশা চিবোচ্ছে। সামান্য একটু নুন মেশাল টক দই-এ, চামচে তুলে চালান করছে পেটে।

ডাল দিয়ে ভাত মাখলেন শুভময়। ছোট্ট প্লেটে গন্ধরাজ লেবু কেটে দিয়েছে জগন্নাথ, অল্প লেবু চিপে নিলেন ভাতে। কলাই-ডালের সঙ্গে লেবুর সুঘ্রাণটি তাঁর বড় প্রিয়।

জগন্নাথ ঝিমলিকে জিজ্ঞেস করল,—দিদি, এক পিস্ মাছও খাবে না?

ঝিমলি কাঁধ ঝাঁকাল,—দে। একটাই দিবি।

ভেটকি মাছে কাঁটা নেই তেমন। চামচ দিয়ে কেটে কেটে খাচ্ছে ঝিমলি। দেখে

মজা লাগছিল শুভময়ের। চাকরির সুবাদে অজস্র কেতাদুরস্ত পার্টি তাঁকে অ্যাটেন্ড করতে হয়েছে সারাজীবন, নামী-দামী ক্লাব-হোটেলেও তিনি যাওয়া-আসা করেননি এমন নয়, তবু এখনও চামচ দিয়ে মাছ খাওয়ার দৃশ্য দেখতে কেমন আজব লাগে। মনে হয় যে খাচ্ছে সে যেন পুরো স্বাদটা পাচ্ছে না।

ঝিমলি এক টুকরো হাইব্রিড টোম্যাটো মুখে ফেলল। ভুরু নাচিয়ে কৌতুকের গলায় বলল,—তারপর? তোমার সেই গার্লফ্রেন্ডের কী খবর?

ঠাট্টাটা উপভোগ করতে পারলেন না শুভময়। তবু হাসলেন,—গার্লফ্রেন্ডের কী আছে? আমি তো যাই বাচ্চাটার কাছে। বলেই স্বরে অভিমান ফুটল সামান্য,—ওদের সঙ্গে তাও তো আমার সময়টা কাটে। তোরা আমায় আর কতটুকু সঙ্গ দিস?

—অবুঝের মতো কথা বোলো না বাবা। কতটুকু ফুরসত পাই? দেখছ তো, সারাদিনই দৌড়তে হচ্ছে। তাও তো ফাঁক পেলেই চলে আসি।

—আমি তো তোকে দোষ দিইনি। তোদের লাইফস্টাইলের নেচারটাই তো এরকম। এমনই তোদের চাপ, যে পুচকুনটাকে পর্যন্ত আনার সময় পাস না।

—সত্যিই চাপ থাকে বাবা। শুধু আমাদের নয়, পুচকুনেরও। কী গেদে গেদে টাস্ক দেয় স্কুলে। তার ওপর এভরি উইকে ক্লাসটেস্ট। প্লাস ধরো সুইমিং-এ ভর্তি হয়েছে, দু'দিন করে ক্যারাটে ক্লাস থাকে...। মাছ শেষ করে এক ঢোক জল খেল ঝিমলি,—মোর ওভার, বি প্র্যাক্টিকাল বাবা। পুচকুনের বয়সি একটা নরমাল বাচ্চা তো সমবয়সি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গই বেশি পছন্দ করবে। এখানে এলে ও কাকে পাবে? এক ঘণ্টায় বোর হয়ে যায়। এক, তোমার কম্পিউটারে যদি নতুন নতুন গেম্স লোড করো, তাহলে সেই লোভ দেখিয়ে নয় ওকে এখানে...

—ফোন-টোনও তো করতে পারে মাঝে মাঝে। ওর গলা শুনলেও তো আমার ভালো লাগে।

—সে তো তুমিও করতে পারো। করো কি?...কিছু মনে কোরো না বাবা,...আমার এই নিয়ে কোনও হার্ড ফিলিংস্ও নেই...একটা অ্যাবনরমাল বাচ্চার জন্য তোমার যতটা টান আছে, নিজের নাতির প্রতি কিন্তু ততটা নেই।

প্রচণ্ড আহত হলেন শুভময়। তিনি কি মেয়েকে বুক চিরে দেখাবেন, পুচকুনের জন্য তাঁর কতটা রক্ত ঝরে? কিংবা সেই সুদূর পুনেতে থাকা ছোট্ট টুকটুকের জন্য? ওই গভীর স্নেহই তো পথ খুঁজছিল, তন্ময়কে পেয়ে আছড়ে পড়েছে তার ওপর।

ঝিমলি চোখ সরু করে দেখছিল বাবাকে। বলল,—খুব খারাপ লাগল বুঝি কথাটা?

শুভময় সর্ষের ঝাল থালায় উপুড় করলেন। ম্লান হেসে বললেন,—নাহ্। হয়তো ঠিকই বলেছিস। আমারই হয়তো তোদের কাছে বার বার ছুটে যাওয়া উচিত ছিল।

—ওফ্, বাবা! তুমি না সত্যি...! তুমি থাকো না তোমার মতো। তোমার যেভাবে ভালো লাগবে, আমি তাতেই খুশি। ঝিমলির প্লেটে অল্প একটু চাটনি দিয়ে গেছে জগন্নাথ, এতক্ষণে চামচ রেখে আঙুলে চাটনি লাগাল ঝিমলি। হঠাৎই প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলল,—যাক গে, একটা কাজের কথা জিজ্ঞেস করি। দাদার খবর জানো?

—কী?

—দাদা ফ্ল্যাট কিনছে?

—হ্যাঁ। ই-মেল করেছে।

—তোমার কাছে টাকা চেয়েছে?

—হ্যাঁ। লাখ খানেক মতো। বলছে ইনিশিয়াল টাকাটায় কিছু শর্ট পড়ে গেছে। এরপর বাকিটার জন্যে ব্যাংক লোন নেবে।

—হাতে ক্যাশ টাকা না থাকলে ফ্ল্যাট কেনার দরকার কী?

—ফালতু ফালতু এক কাঁড়ি টাকা ভাড়া গুণছে এখন। রেন্ট মানে তার নো রিটার্ন। শুভময় অজান্তেই ছেলের পক্ষ নিয়েছেন,—তার চেয়ে যা হোক করে নিজের একটা কিছু বানিয়ে নেওয়াই তো ভালো। ব্যাংক লোন নিলে ইনকাম ট্যাক্সেও মোটা ছাড় পাবে। আলটিমেট্লি, ভাড়ার চেয়ে খুব বেশি খরচা না করে নিজের একটা অ্যাসেটও হয়ে যাবে।

—সবই ঠিক। কিন্তু...। ঝিমলি প্লেটে আঙুল ঘষছে,—জানো অনুপমের কাছেও টাকা চেয়েছে? এক লাখ। না পারলে অন্তত পঞ্চাশ হাজার। লোন।

—তাই?

—আমি বুঝতে পারছি না অ্যাদ্দিন ধরে আপনিকোপনির সংসার করে কী জমাল? ঝিমলির ঠোঁট বিদ্রূপে বেঁকে গেল,—ঠিক আছে, নয় সেভিংস্ করতে পারেনি। কিন্তু তা বলে এভাবে টাকা চাওয়া কেন?

—আহা, প্রয়োজন হলে তো আপনজনদেরই বলবে।

—আমাকে বলতে পারত। হোয়াই অনুপম? তাও আমাকে একবারও না জিজ্ঞেস করে! ঝিমলির মুখ আরও গোমড়া,—আমি অনুপমের কাছে খেলো হয়ে গেলাম; ও আমাকে টিজ করল।

—অত সিরিয়াসলি নিচ্ছিস কেন? অনুপমের সঙ্গে তো ওর ফ্রেন্ডলি টার্ম!

—হতে পারে। বাট আই অ্যাম হিজ সিস্টার। এসব টাকাপয়সার ব্যাপারে ওর প্রপার চ্যানেলে যাওয়ার সহবতটা থাকা উচিত। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল ঝিমলি। লাগোয়া বেসিনে হাত ধুচ্ছে। হ্যাঙারে ঝোলানো তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে বলল,—তুমি দিচ্ছ টাকা?

—হুউম্।

—অনুপমও দেবে। কিন্তু তুমি দাদাকে জানিয়ে দিও ওর এই চাওয়ার প্রসেডিওরটা আমার পছন্দ হয়নি। ডাইরেক্ট আমায় বললে আমিও আমার টাকা থেকে দিতে পারতাম।

শুভময় হাল্কা সুরে বললেন,—তোর আর অনুপমের টাকা কি আলাদা?

—নিশ্চয়ই। আমার খাটুনির টাকা আমার। অনুপমেরটা অনুপমের। সংসারের খরচাও আমাদের ডিভিশান করা আছে। সেভিংস্ও আমরা নিজেদের মতো করি। একজনের দরকার হলে অন্যজনের কাছ থেকে লোন দিই।

শুভময়ের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—ইন্টারেস্ট্ নিস্ না?

—ঠাট্টা করছ?...শোন বাবা, টাকাপয়সার ব্যাপারটা সব সময়েই ক্লিয়ার থাকা ভালো। ইভন্ হাজব্যান্ড-ওয়াইফের রিলেশানেও। আজ হঠাৎ যদি আমাদের সম্পর্কটা ছিঁড়ে যায়, তখন অন্তত টাকাপয়সা নিয়ে কেউ কাউকে চার্জ করতে পারবে না।

—এখনও তোরা সম্পর্ক ভাঙা-টাঙার কথা ভাবিস নাকি? বিয়ের ন'বছর পরেও?

—বিয়ের ঊনত্রিশ বছর পরেও রিলেশন ভাঙে বাবা। কার কখন মতিভ্রম হয় কেউ ফোরকাস্ট করতে পারে? ঝিমলি গাম্ভীর্য ঝেড়ে ফেলে ফিকফিক হাসছে,—ধরো, আমিই হঠাৎ বুড়ো বয়সে কোনও কন্দর্পকান্তি যুবকের প্রেমে পড়ে গেলাম।

ঘরের আবহাওয়া তরল হয়ে গেছে। শুভময়ের আহার শেষ, আঁচিয়ে নিয়ে টুকটাক রসিকতা চালাচ্ছেন মেয়ের সঙ্গে। ঝিমলিও টিপ্পনী কাটছে পুটুর পুটুর। জগন্নাথের দেশ থেকে চিঠি এসেছে গত সপ্তাহে। বাপ-কাকারা পাত্রী খুঁজছে জগন্নাথের জন্য। তাই নিয়ে কিছুক্ষণ জগন্নাথের পিছনেও লাগল বাপ- মেয়ে। জগন্নাথের মুখ লজ্জায় লাল। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

বেশিক্ষণ অবশ্য বসা হল না ঝিমলির। ঘণ্টাখানেক বিস্ময়করভাবে অচেতন থাকার পর ঝিমলির মোবাইল বিপুল উদ্যমে ডাকাডাকি শুরু করেছে। এই ঘোর বর্ষাতেও। কালো আকাশ মাথায় নিয়ে নিয়ম মতোই ব্যস্তসমস্ত ভাবে চলে গেল ঝিমলি।

আবার বৃষ্টি পড়ছে টিপটিপ। ইংরিজি কাগজটা হাতে নিয়ে শুভময় বারান্দায় এলেন। সকালে ব্যাংকে বেরোনোর তাড়া থাকায় ক্রসওয়ার্ড নিয়ে বসা হয়নি, কলম খুলে মন দিয়েছেন শব্দ খোঁজার খেলায়। হঠাৎই একটা খবরে চোখ আটকে গেল। প্রেমিক আর তার তিন বন্ধু মিলে একটি মেয়েকে নির্জনে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেছে। ছিছি, কী বিশ্রী ব্যাপার! প্রেমিকটি কী ধরনেব পশু, যে নিজের

প্রেমিকাকে ওভাবে চরম অপমানের মুখে ঠেলে দিতে পারে? বোধহয় প্রেম-ট্রেম কিছু ছিলই না, রিরংসার তাড়নায় ছলনা করেছে মেয়েটির সঙ্গে। মানব-মানবীর সম্পর্কে ওই জৈবিক আকর্ষণ ছাড়া আর কিছুই কি নেই?

হঠাৎ পরমার কথা মনে পড়ল শুভময়ের। শারীরিক ব্যাপার-স্যাপারে পরমার কোনও দিনই তেমন আগ্রহ ছিল না। নিজেও কি শুভময় খুব একটা লালসাপ্রবণ পুরুষ ছিলেন? উঁহু, মোটেই না। পরমার মেনোপজের অনেক আগে থেকেই তো তাঁদের দৈহিক সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। ন'মাসে ছ'মাসে কখনও হয়তো হঠাৎ ইচ্ছে হল...। তাতেও তো তাঁদের বন্ধন গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়েছে দিন দিন। পরমার চোখের দিকে তাকালে বুঝতে পারতেন পরমা কী বলতে চান। পরমাও তাঁকে পড়তে পারতেন আদ্যোপান্ত। চিরকালই শুভময় অন্তর্মুখী হওয়া সত্ত্বেও। ঝিমলি আর অনুপমের মধ্যে এই বোঝাপড়া তৈরি হয়েছে? কিংবা বাবুল আর শ্বেতার মধ্যে? মানুষের জীবনের প্রায় সব সম্পর্কই রক্তের সূত্রে পাওয়া। শুধু এই একটা সম্পর্কই গড়ে তুলতে হয়। এখানে একাত্মতার অনুভূতিটা কি একান্তই জরুরি নয়?

এলোমেলো ভাবনার মাঝে চোখ দুটো কখন জড়িয়ে এসেছিল। একটা ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্নও ভেসে আসছিল চোখে। চন্দ্রপুরার সেই বিশাল কোয়ার্টারটা। পিছনের বাগানে একটা দোলনা বসিয়েছিলেন পরমা...পালা করে সেখানে দোল খাচ্ছে বাবুল আর ঝিমলি...অফিস থেকে ফিরলেন শুভময়, দৌড়ে এল ছেলে আর মেয়ে। ডাকছে, বাবা, বাবা...

ঝট করে চোখটা খুলে গেল শুভময়ের। সামনে জগন্নাথ। ডাকছে,—বাবা? বাবা?

—কীই?

—ওই মেয়েটা...সুমতি...আপনাকে ডাকছে। ওদের বাড়ির ছেলেটার নাকি খুব শরীর খারাপ।

—কী হয়েছে?

—বলছে হঠাৎ নাকি নিশ্বাসের কষ্ট...

—সে কী?

চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন শুভময়। ত্বরিত পায়ে নেমে এসেছেন নীচে। সুমতি সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞেস করলেন,—কী ব্যাপার, হঠাৎ নিঃশ্বাসের কষ্ট?

—সকালেই গা'টা ছ্যাঁকছ্যাঁক করছিল। দিদি যাব না যাব না করেও অফিস গেল। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর হঠাৎ জ্বরটা বেড়ে গেছে। আর কেমন যেন হাঁপাচ্ছে।

—দিদিকে খবর দিয়েছ?

—কী করে দেব? আগে আপনার কাছে এলাম।

—ও। তন্ময় কি একা আছে?

—হ্যাঁ। উপায় না দেখে...

পলকে শুভময় ইতিকর্তব্য স্থির করে নিলেন। যেভাবে বয়লার খারাপ হলে, কি প্ল্যান্ট বসে গেলে মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিতেন সেভাবেই বললেন,—জগন্নাথ, তুই সুমতির সঙ্গে যা তো। ঝটপট দিদির টেলিফোন নাম্বারটা নিয়ে আয়।

সুমতি বলল,—আমি এনেছি সঙ্গে। এই যে।

—গুড। দাও।

কাগজের টুকরোখানা হাতে নিয়ে পরবর্তী নির্দেশ,—তুমি বাড়ি চলে যাও। ছেলেটার কাছে থাকো। আমি আসছি।

লম্বা লম্বা পায়ে ওপরে ফিরেই ফোন। ও প্রান্তে মালবিকা খবর শুনেই হাউমাউ করে উঠেছে,—কী হবে?

—ডোন্ট গেট নার্ভাস। আমি দেখছি। লোকাল কোনও ডাক্তার কি ওকে দেখে?

—হ্যাঁ, বিমান ঘোষ। বাসস্ট্যান্ডে ওই মিষ্টির দোকানটার পাশেই চেম্বার। কিন্তু উনি তো ওখানে এখন থাকবেন না। চেম্বারে তো বসেন সাতটা থেকে।

—ঠিক আছে, ডোন্ট ওরি। আমি একটা কিছু অ্যারেঞ্জ করছি। তুমি অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল্ চলে এসো।

—এক্ষুনি বেরোচ্ছি।

সদর দরজায় তালা দিয়ে জগন্নাথকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন শুভময়। রিকশা নিয়ে সোজা মিষ্টির দোকান। সেখান থেকে ডাক্তারের হদিস জেনে নিয়ে ছুটেছেন আবার। ভাগ্য ভালো, কাছেই থাকে বিমানডাক্তার। অল্পবয়সী ছেলে, বছর চল্লিশ হবে জোর, রমরমা পশার। সবে সকালের চেম্বার আর সকালের কল সেরে বাড়ি ফিরে খেতে বসেছিল বেলা সাড়ে তিনটেয়, তন্ময়কে সে ভালোই চেনে, তন্ময়ের জরুরি তলবে বেরিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে।

আধঘণ্টার মধ্যে ডাক্তার নিয়ে পৌঁছে গেলেন শুভময়। বিমান ভালো করে পরীক্ষা করল তন্ময়কে। ভুরু কুঁচকে বলল,—খুব সর্দি বসেছে। ঘড়ঘড় করছে ভেতরটা।

সুমতি পাশ থেকে বলল,—যা বর্ষা...ঠাণ্ডা লেগে গেছে।

—হ্যাঁ। তবে এর ফিজিকাল সিস্টেম তো খুব ডেলিকেট, এ সময়ে একে আরও সাবধানে রাখা উচিত ছিল।

শুভময় নার্ভাস গলায় বললেন,—ভয়ের কিছু নেই তো?

—মনে তো হচ্ছে না। তবু টু বি ইন্‌ দা সেফার সাইড, ব্রিদিং ট্রাবলের জন্য আমি একটা ইনজেকশান লিখে দিচ্ছি, এখনই আনিয়ে পুশ করে দিন, হাঁপ কমে যাবে। আর জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল্‌। ইন্‌ফেকশানের জন্য অ্যান্টি-বায়োটিকও রইল, কোর্সটা স্টার্ট করে দিন।

বিমানডাক্তার বিদায় নেওয়ার পর জগন্নাথকে পাঠিয়ে ওষুধপত্র আনিয়ে নিলেন শুভময়। পপুলার ড্রাগ হাউসের বঙ্কিম কম্পাউন্ডার ইনজেক্‌শানও দিয়ে গেল। তবু যেন শুভময় স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। ঠায় বসে আছেন ছেলেটার মাথার কাছে। খুবই কাহিল হয়েছে তন্ময়, বন্ধুকে দেখেও তার চোখে কোনও উচ্ছ্বাস নেই।

প্যারাসিটামলে জ্বর নামছে। নিশ্বাসের কষ্টও কমল অনেকটা। আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ছে তন্ময়। শুভময় ছেলেটার কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। তন্ময়ের ঘাড় হেলে গেছে একপাশে, ঘামছে, মুখ হাঁ, কষ বেয়ে গড়িয়ে আছে লালা...দেখে বুকটা কেমন চিনচিন করছিল শুভময়ের। তোয়ালেতে বার বার মুছিয়ে দিচ্ছিলেন তন্ময়ের মুখ, থেকে থেকে হাত রাখছিলেন ছেলেটার মাথায়...কেমন যেন আর্দ্র হয়ে আসছিল ভেতরটা। হৃদয়ের অতল কুয়োয় ঢেউ কাঁপছে তিরতির। কেন যে কাঁপছে? স্নেহে? মায়ায়? উদ্বেগে? নাহ্‌, শুভময় ঠিক এখনকার অনুভূতিটাকে পড়ে উঠতে পারছিলেন না। বিদ্যুৎ ঝলকের মতো একবার মনে বেজে উঠল ঝিমলির কথাটা। পুচকুনের অসুখের খবর শুনে সত্যিই কি তিনি এতটা বিচলিত হতেন? পুচকুনকে দেখার জন্য অনেকে আছে, কিন্তু এই ছেলেটা বড্ড অসহায়—এই পার্থক্যটাই কি তাঁকে এত দুর্বল করল?

বাইরে ট্যাক্সির আওয়াজ। মালবিকা ফিরল। উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে এসেছে ঘরে। শুভময় তাকে জানালেন সব। শান্ত করলেন। তবু যেন মালবিকা ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। ঝুঁকে ঝুঁকে দেখছে ছেলেকে। বার বার হাত রাখছে ছেলের গালে গলায় কপালে।

জগন্নাথ বাড়ি গেছে। সুমতি চা করে আনল। কথা হচ্ছে একটা-দুটো। একটু একটু করে ছন্দে ফিরছে পরিবেশ। তন্ময়ের টেম্পারেচার দেখে মুখে যেন একটু আলোও ফুটল মালবিকার।

আটটা বাজে। তন্ময় এখনও ঘুমোচ্ছে। বাড়ি ফেরার জন্য শুভময় উঠে পড়লেন।

মালবিকাও এসেছে সঙ্গে সঙ্গে। একটু আগের ঘন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখ কৃতজ্ঞতায় মাখামাখি। গেটটা ধরে বলল,—আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না। আপনি আজ না থাকলে...

—আহ্‌, থাক না ওসব।...একটা কথা বলব? শুনবে?

—বলুন?

—এবার একটা টেলিফোন নিয়েই নাও। সুমতি তো সব সময়ে আমায় নাও পেতে পারে।

—হুম্। ফোনটা রাখাই উচিত ছিল। শুভময়ের কথার প্রতিবাদ না করে মাথাটা ঈষৎ নোওয়াল মালবিকা। নত মুখেই বলল, এবার আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

—করো।

—ডাক্তারের ফিজ্ ওষুধ ইন্জেকশান সব মিলিয়ে কত পড়ল আপনার?

শুভময় থতমত খেলেন।

মালবিকা ফের বলল,—প্লিজ, টাকাটা নিয়ে নেবেন।

বেশি আত্মমর্যাদাবোধ কখনও কখনও অন্যকে আঘাত করে, এ কথা কি বোঝে না মেয়েটা? শুভময় কষটে গলায় বললেন,—নিতেই হবে?

—প্লিজ, না করবেন না। যুদ্ধের এই অংশটুকু অন্তত আমায় একা লড়তে দিন।...আর একটা কথা। মালবিকা থামল ক্ষণকাল। আঁচলের খুঁট আঙুলে পাকাতে পাকাতে বলল,—পরশু...মানে শনিবার রাত্তিরে আপনি কিন্তু এখানে খেয়ে যাবেন।

—কেন বলো তো?

—পরশু বাবুর জন্মদিন। মা টা কাউকে সেদিন ডাকি না আমি, উল্টে বারণই করি আসতে। যে ছেলে আজ আছে কাল নেই, তার জন্মদিনে কী উৎসব করব?...কিন্তু আপনি আসবেন। ঠোঁটের কোণে চিলতে হাসি ফুটল মালবিকার,—আপনার একারই নেমন্তন্ন।

হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না শুভময়। ফিরছেন ধীর পায়ে। খানিক দূরে গিয়ে ঘুরে তাকালেন।

মালবিকা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। স্থির। সিল্যুয়েটের মতো।

ছয়

জগন্নাথের দাদা এসেছে দেশ থেকে। বছরের এই সময়টায় হাত খালি হয়ে যায় জগন্নাথের পরিবারের, দাদা-বাবা কেউ না কেউ আসেই তখন, থোক কিছু টাকাপয়সা নিয়ে যায়। চাষিদের সংসারে জগন্নাথের করকরে মাইনেটা বেজায় মূল্যবান।

সঙ্গে শুভ সংবাদটাও এনেছে বলরাম। পাত্রী নির্বাচনের পালা শেষ, সামনের অঘ্রানে জগন্নাথের বিয়ের দিন ফেলা হচ্ছে। জগন্নাথ চাইলে তার আগে গিয়ে একবার স্বচক্ষে কনে দেখে আসতে পারে। মেয়ে নাকি বেশ ফর্সা, ক্লাস ফাইভ অবধি পড়েছে। বয়স সতেরো ছুঁইছুঁই, জগন্নাথের সঙ্গে ভালোই মানাবে।

শুভময় রসিকতা জুড়লেন,—কী রে, মেয়ে দেখতে যাবি নাকি?

জগন্নাথ জোরে জোরে ঘাড় নাড়ল দু'দিকে। যাবে না এখন।

বলরাম বলল,—অঘ্রানে কিন্তু এক মাস মতো ছুটি দিতে হবে বাবু।

—হুঁ। সে তো বটেই।

শুভময় বললেন বটে, তবে একটু চিন্তাতেও পড়ে গেলেন। এখন ছেলেমেয়ের মুখ না দেখলে তবু তাঁর চলে, কিন্তু জগন্নাথ বিহনে সাত দিনেই তো তিনি চোখে সর্ষেফুল দেখবেন। আগের বারই যা হাঁড়ির হাল হয়েছিল! একটা মেয়েলোক রান্না করে দিয়ে যেত বটে, তবে তা মুখে তোলা যায় না। ঠিকে কাজের একটা মেয়েও ছিল, কিন্তু যে মানুষ মুখের কথা খসানোর আগে হাতের গোড়ায় জিনিস পেতে অভ্যস্ত, তার কি ওসব ঠেকনা লোকে কাজ চলে? আবার তাঁর সুখ দেখতে গিয়ে জগন্নাথ আইবুড়ো হয়ে বসে থাকবে, এটাও তো চরম স্বার্থপর চাওয়া।

বলরামকে জিজ্ঞেস করলেন,—তা জগা এখানেই বউ নিয়ে আসবে তো?

—নতুন নতুন হয়তো আসতে পারবে না। চার-ছ'মাস পর...

—তা কেন, একেবারে নিয়েই চলে আসুক। এখানে থাকার তো কোনও অসুবিধে নেই। একতলায় থাকবে, দুজনে মিলেমিশে ঘরদোর সামলাবে...। বউ যদি এদিক দেখে, মালিটার ওপরও আমায় আর নির্ভর করে থাকতে হবে না, জগাই বাগানের কাজে মন দিতে পারবে।

—দেখা যাক কী হয়।

—না না, পাঠিয়ে দিও। জগারও তাহলে সারাক্ষণ মন আনচান করবে না।

বলরাম আর কিছু বলল না। ঘাড় নিচু করে হাত কচলাচ্ছে।

বিকেলের চায়ে শেষ চুমুকটা দিয়ে শুভময় উঠে পড়লেন। ঘরে গিয়ে পাঞ্জাবিটা গলিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন মিনিট খানেক। জগন্নাথ বউ নিয়ে এলে ভালোই হয়। আবার একটা নারীর হাতের ছোঁয়া পাবে সংসারটা। বাচ্চাকাচ্চা হবে জগন্নাথের, বাড়িটা দিব্যি ভরবে আবার। অন্তত এই ভূতের পুরী, ভূতের পুরী ভাবটা থাকবে না। জগন্নাথকে মাথায় ঢুকিয়ে দিতে হবে, বিয়ে করে অবশ্যই যেন বউ নিয়ে চলে আসে।

আলমারি খুলে পার্সটা নিলেন শুভময়। জানালার ধারে এসে ঝলক দেখে নিলেন আকাশটাকে। নাহ্, টুকরো-টাকরা মেঘ আছে, তবে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। ছাতা আজ না নিলেও চলবে। মালবিকাদের বাড়ি যাওয়ার পথে স্টেশনারি দোকানটা ঘুরে যাবেন একবার। ওখানে একটা রোবট দেখেছিলেন। ব্যাটারি লাগিয়ে দিলে খুদে যন্ত্রমানব দুলে দুলে হেঁটে বেড়ায় ঘরময়। ওটা পেলে তন্ময় দারুণ খুশি হবে। সঙ্গে একখানা মিল্ক চকোলেট নিয়ে নেবেন বড় দেখে। নালে-ঝোলে একাকার করে ঠিকই, তবে চকোলেট খেতে ছেলেটা বড্ড ভালোবাসে।

শুভময়ের কপাল খারাপ। আজকালকার দিনে রোবটের বিশাল চাহিদা, দোকানে স্টক নেই। অগত্যা একটা উড়োজাহাজ নিলেন। দেখতে অবশ্য বেশ। চিকচিক আলো জ্বলে, গর্জনও করে ডানা ছড়িয়ে। শুধু উড়তে পারে না, এই যা। কাল সকাল থেকে তন্ময়ের আর জ্বরটা নেই, বিকেলে তো কাল বেশ চাঙ্গা ছিল। আজ নিশ্চয়ই খেলনাটা নিয়ে হুটোপুটি করবে ছেলেটা।

মালবিকাদের বাড়ি পৌঁছে মনের ফুরফুরে ভাবটা মিলিয়ে গেল। আবার জ্বর এসেছে তন্ময়ের। বিছানায় নেতিয়ে পড়ে আছে বেচারা। খেলনাটা দেখে একটু যেন হাসি ফুটল রুগ্ন মুখে, পরক্ষণে চোখ বুজেছে।

উদ্বিগ্ন স্বরে শুভময় বললেন,—ডাক্তারকে জানিয়েছ?

—সকালে চেম্বারে গেছিলাম। মালবিকা শুকনো মুখে বলল,—অ্যান্টিবায়োটিক বদলে দিল। কয়েকটা টেস্ট করাতেও বলেছে। ডায়াগোনেস্টিক সেন্টারেও গেছিলাম। কাল রোববার, কাল ওদের লোক কালেকশানে আসতে পারবে না...সেই পরশু সকালে ব্লাড নিয়ে যাবে। চেস্ট এক্সরেটাও সোমবার নিয়ে গিয়ে করিয়ে আনব।

শুভময় বললেন,—এ তো ভারী চিন্তার ব্যাপার হল।...নিশ্বাসের কষ্টটা আছে?

—ব্রিদিংটা তো নরমালই লাগছে।

—আর একটু বড় ডাক্তার দরকার, কল দিলে হয় না? আমার মেয়ের অনেক চেনাজানা ডাক্তার আছে। বলো তো ওর থ্রু দিয়ে ইমিডিয়েটলি অ্যাপয়েন্টমেন্টও করে দিতে পারি।

—সে তো ডক্টর সেনগুপ্তও আছেন। নিউরোলজিস্ট। বাবুকে যিনি দেখেন। ভাবছি পরশু ওঁকে একবার মিট করব। দুপুরে ফিজিওথেরাপি করতে যে ভদ্রলোক আসেন তিনি বলছিলেন একজন ভালো চেস্ট স্পেশালিস্টও দেখিয়ে নেওয়া উচিত।

—হুম্। জ্বরটা যেভাবে রিল্যাপ্স করল...

সুমতি অন্দর থেকে ডাকছে,—দিদি, একবার শুনে যাবে? দ্যাখো না পায়েসের মিষ্টিটা ঠিক হলো কিনা।

মালবিকা উঠে গেল ভেতরে। শুভময় অস্বস্তি বোধ করছিলেন। যার আজ জন্মদিন, সে কাহিল হয়ে পড়ে আছে, আর তিনি কিনা বসে নেমন্তন্ন খাবেন? এসব আয়োজনের কোনও অর্থ হয়? পায়েস-টায়েস...। বেতের মোড়া টেনে খাটের ধারে এসে বসলেন শুভময়। হাত বাড়িয়ে ছুঁলেন তন্ময়কে। গা খুব তপ্ত নয়, তবে একশো, একশো এক তো আছেই।

বন্ধুর স্পর্শ পেয়ে তন্ময় চোখ খুলেছে। ঘড়ঘড় একটা শব্দ হল গলা দিয়ে। ফের চোখ বুজেছে।

তখনই কলিংবেলটা বেজে উঠল।

মালবিকা বা সুমতি আসার আগে শুভময়ই গেছেন বারান্দায়।

গ্রিলের ওপারে বছর চল্লিশ-বিয়াল্লিশের এক ভদ্রলোক। পরনে নেভি ব্লু ট্রাউজার, আকাশনীল বুশশার্ট, চোখে রিমলেস চশমা। শৌখিন চেহারা। শুভময়কে দেখে একটু যেন থমকেছে লোকটা। আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করল,—মালবিকা মিত্র...?

—এই বাড়ি।

—মালবিকা আছে?

মালবিকার দাদা নাকি? আগে কি আসেনি এ বাড়িতে?

শুভময় তাড়াতাড়ি বললেন,—আছে। আসুন আসুন।

গ্রিল পেরিয়ে সবে ঢুকেছে লোকটা, হঠাৎই পিছনে মালবিকার তীক্ষ্ণ স্বর,—দাঁড়াও।...তোমাকে না আমি আসতে বারণ করেছিলাম?

লোকটা গুটিয়ে গেছে। কাচুমাচু মুখে বলল,—আজ বাবুর জন্মদিন...তোমাকে তো আমি সেদিন ফোনে বললাম...

—আমি তো সেদিনই বারণ করে দিয়েছি।

—এ তোমার অন্যায় জেদ মিলু। আমার ছেলেকে আমি দেখতে আসব না?

—বাবুর বাবা মরে গেছে।

—মিলু...।

—জন্ম দিলেই বাবা হওয়া যায় না। বাবাকে বাবার মতো হতে হয়। বাবা হয়ে উঠতে হয়।

—জানি। সেই জন্যই তো আমি...

—থাক। তুমি এসো। ভবিষ্যতে আর যোগাযোগ করার চেষ্টা কোরো না।

—মিলু, তুমি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছ। আমি যদি কোর্টে যাই...

—যেখানে খুশি যাও। যা খুশি করো। দয়া করে তোমার এই মুখোশপরা মুখটা আর দেখাতে এসো না।

লোকটা একবার শুভময়ের দিকে তাকাচ্ছে, একবার মালবিকার দিকে। তারপর মাথা নিচু করে শ্লথ পায়ে বেরিয়ে গেল।

উত্তেজনায় লাল হয়ে গেছে মালবিকার মুখ। দাঁতে দাঁত ঘষছে, শ্বাস ফেলছে লম্বা লম্বা। শুভময় হতচকিত। আচমকা এমন একটা নাটকীয় পরিস্থিতির মাঝখানে পড়ে যাবেন, কল্পনাতেও ছিল না। এই মুহূর্তে তাঁর কী করা উচিত? চুপচাপ ঘরে গিয়ে বসবেন? নাকি একটু ঘুরে ফিরে আসবেন, মেয়েটাকে সময় দেবেন শান্ত হওয়ার?

শুভময়কে ন যযৌ ন তস্থৌ দশা থেকে মালবিকাই মুক্তি দিল। এতক্ষণে তার হুঁশ ফিরেছে। ভারী গলায় বলল,—এখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ঘরে আসুন।

অনুরোধ প্রায় নির্দেশের মতো শোনাল। নিঃশব্দে ঘরে ফিরলেন শুভময়। মালবিকা অবশ্য দাঁড়াল না, ফের অন্দরে ঢুকে গেছে। দু'তিন মিনিট। ফিরেছে আবার। খাটে বসে ছেলের কপালে হাত রেখে জ্বর দেখল। প্রায় স্বাভাবিক স্বরে বলল,—এখন তো মনে হচ্ছে টেম্পারেচার নেই।

শুভময় সাড়া করলেন না। অন্যমনস্ক মুখে তাকিয়ে আছেন ঘুমন্ত তন্ময়ের দিকে।

খাটের কোণায় হাঁটু মুড়ে বসল মালবিকা। থুতনি রেখেছে হাঁটুতে। ভাবছে কী যেন। একটা গাঢ় নৈঃশব্দ্য ছেয়ে গেছে ঘরে। বাইরে বিকেল মরে আসছে। কমছে ঘরের আলো। তন্ময়ের পায়ের দিকে জানালার একটা পাট খোলা, গ্রিল টপকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকছে অন্ধকার। আশপাশের কোনও বাড়িতে উচ্চগ্রামে টিভি চলছে। একটা পুরনো দিনের হিন্দি গানের সুর ভাসছে হাওয়ায়। বাইরের রাস্তা দিয়ে তীব্র গতিতে একখানা মোটরবাইক চলে গেল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার যান্ত্রিক গর্জন লেগে রইল কানে। সময় কাটছে। সময় থেমে আছে।

হঠাৎই মালবিকার স্বর ফুটল,—আমার চেহারাটা দেখলেন তো?

শুভময় চমকে বললেন,—অ্যাঁ?

—দেখলেন তো, আমি কী রকম বদমেজাজি? দজ্জাল?

শুভময় চুপ।

মালবিকা আবার একটুক্ষণ থেমে থেকে নিজের মনে বিড়বিড় করে উঠল,—

আমার এই চেহারাটাই লোকে দেখে। কষ্টটা কেউ বোঝে না। কত অপমান যে আমায় সইতে হয়।

এবার শুভময় নীরব।

—নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছেন কে এসেছিল?

শুভময় অল্প মাথা দোলালেন,—হুঁ।

—সুব্রত কেন এসেছিল জানেন? মালবিকা মুখ তুলে সোজাসুজি তাকিয়েছে,—ঢং করতে। আহ্লাদ দেখাতে। আমার ওপর করুণা শো করতে।...এত বড় স্পর্ধা, আমায় এতদিন পর বলে কিনা ছেলের বার্ডেন তুমি একা কেন বইবে, আমিও কিছু শেয়ার করি...! ভাবুন কথাটা! বাবু নাকি আমার ব্যর্ডেন! নিজের দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে দেওয়ার সময় মনে ছিল না, এখন কয়েকটা টাকা দিয়ে নিজের বিবেক সাফ করতে চায়!...ভাবতে ঘেন্না হয়, এই সুব্রতকে আমি ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম!

শুভময় অস্ফুটে জিজ্ঞেস করলেন,—তোমাদের কতদিন হল ছাড়াছাড়ি হয়েছে?

—আইনের হিসেবে বছর দুয়েক। মনের দিক দিয়ে আরও আরও অনেক আগে। বলতে পারেন বাবু হওয়ার পর থেকেই। মালবিকা বড়ো একটা শ্বাস ফেলল,—আপনাকে বলতে সংকোচ নেই, ওই সুব্রতকে ছাড়া একসময়ে আমি জীবনটাকে ভাবতেই পারতাম না। অথচ এই সুব্রতই বাবু হওয়ার পর কেমন বদলে গেল। প্রথম প্রথম ছেলে নিয়ে ছোটাছুটি ডাক্তারবদ্যি করেনি তা নয়, কিন্তু বছর দুয়েকের মধ্যে দম শেষ। বাবুকে আর সহ্য করতে পারত না। এমনকি আমি যে অফিসের টাইমটুকু ছাড়া সারাক্ষণ বাবুকে নিয়ে পড়ে আছি, এও তার পছন্দ নয়। এমনিই তো সারাক্ষণ আমার দিকে আঙুল তুলেছে, যেন ওই অসুস্থ বাচ্চা জন্মানোর জন্য আমিই দায়ী। তার উপর সারাক্ষণ রাগে গনগন করছে, যেন আমি ইচ্ছে করে ওকে সঙ্গ থেকে বঞ্চিত করছি। অবশ্য ওকে তাতানোর পেছনে ওর মা-বোনেরও ইন্ধন ছিল। তারা তো বলত, ক্রিপ্‌ল্‌ড্ বাচ্চা নিয়ে পড়ে থেকে থেকে আমিও নাকি অ্যাবনরমাল হয়ে গেছি। তখন কী যে অশান্তি গেছে! রোজ খিটিমিটি ঝগড়া...আমারও মাথা গরম হয়ে যেত, দুটো কথা বললে আমিও চারটে কথা শুনিয়ে দিতাম। তারপর তো সম্পর্কটাই কীরকম ছাড়া ছাড়া হয়ে গেল। বাড়িতে থাকতে চায় না, রাত করে ফেরে, দু'দিন তিন দিনের জন্য বাইরে চলে যায়...। বাবুর দিকে তো ফিরেও তাকাত না, আমার সঙ্গেও জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কথা নেই। কীভাবে যে দাঁতে দাঁত চেপে ওই সংসারে অতগুলো বছর পড়েছিলাম আমি! বহু সময়ে মনে হয়েছে অপমান হজম না করে বেরিয়ে যাই। তারপর ভাবতাম এই ছেলে নিয়ে একা একা কোথায় যাব! কীভাবে থাকব!

ভাবতাম, মাথার ওপর তাও তো শ্বশুর-শাশুড়ি আছেন...যতই হোক বাবু তাঁদের নাতি...ওঁদের ভরসায় ছেলে রেখে অফিসটুকু তো করা যায়। অবশ্য তখনও আমি বাবুর জন্য কাজের মেয়ে রেখে দিয়েছিলাম। আবার একটা শ্বাস ফেলল মালবিকা,—তা শেষ পর্যন্ত ও বাড়ি ছাড়তেই হল। গলাধাক্কা খেয়ে। অনেক দিন ধরেই কানাঘুষো শুনছিলাম সুব্রত নাকি ওর অফিসের একটি মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। কয়েকবার জিজ্ঞেসও করেছি, সরাসরি উত্তর দেয়নি, এড়িয়ে গেছে। শেষে একদিন বলেই ফেলল, তুমি কাটো। এভাবে একটা অস্বাভাবিক সম্পর্ক টেনে বেড়ানোর কোনও মানে হয় না, আমি ডিভোর্স চাই। বাবুর কী হবে তাই নিয়ে কোনও প্রসঙ্গ তুললই না, যেন তার কাছে বাবুর কোনও অস্তিত্বই নেই।.......তারপর তো আমি বাপের বাড়ি চলে এলাম, ডিভোর্স হল, ডিভোর্সের ছ'মাস পরেই অফিসের সেই মেয়েটিকে বিয়ে করল সুব্রত...। এখন এতদিন পর দরদ দেখিয়ে ছেলের জন্য যদি সে টাকা গুঁজতে আসে, কেমন লাগে বলুন? আমিই বা কেন নেব ওই টাকা?

শুভময় ঘাড় নাড়লেন,—বটেই তো। নেওয়ার কোনও অর্থই হয় না।

—এই ন্যাকামোটা সুব্রত মাঝে মাঝেই করে, জানেন। মালবিকার স্তিমিত স্বর চড়ল সামান্য—সেকেন্ড বিয়েটা করার ছ'সাত মাস পর একদিন আমার অফিসে এসে হাজির। আমাদের জন্য হঠাৎ নাকি তার প্রাণ কেঁদে উঠেছে, বাবুর খরচখরচা বাবদ আমাকে সে মাসে মাসে কিছু সাহায্য করতে চায়। আমি স্ট্রেট হাঁকিয়ে দিয়েছিলাম। এরপর সে ধরল আমার দাদাকে। বোঝাল, সে নাকি ভুল করেছে, অনুতাপে জ্বলছে, ছেলের জন্য সামান্য কিছু করে সে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। শুনলে অবাক হবেন, সুব্রতর মায়াকান্নায় আমার দাদা-বউদি, এমনকি মা'ও গলে জল। আহারে, বাপের প্রাণটা পুড়ছে, মাসোহারা দিলে নিবি না কেন? কী খারাপ যে লেগেছিল! আমার মা পর্যন্ত তখন বলেছে, সুব্রতর দোষ যদি বারো আনা থাকে, তোরও চার আনা ছিল মিলু! তুইই তো চব্বিশ ঘণ্টা ছেলে ছেলে, অসুখ অসুখ করে সুব্রতকে অবহেলা করেছিস, নইলে ওর মন বারমুখো হয়! পুরুষ মানুষের ক্ষিদে-টিদের কথা তো তোর মাথায় রাখা উচিত ছিল! তুই যদি সব দিক একটু মানিয়ে- গুনিয়ে থাকতিস! ...বুঝুন অবস্থাটা, বাপ হয়ে সে যে ছেলেটাকে অত হ্যাক থু করেছিল, সেটা কোনও অপরাধ নয়! অপরাধটা মায়ের! সে কেন স্বামী ভুলে ছেলে ছেলে করেছে! ...আমি যে কেন ওই ভিক্ষের টাকা ছোঁব না, আমার মা-দাদা বুঝলই না। উল্টে শুনতে হল, আমি গোঁয়ার, আমি ইম্প্র্যাক্টিকাল! মান দেখিয়ে সাধা টাকা পায়ে ঠেলে আমি বোকামি করছি! আমার অপমানের গুরুত্বটাই এরা বোঝে না। কেন এদের সঙ্গে আমি থাকব বলুন?

—তুমি এই জন্য বাপের বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছ? শুভময় ইতস্তত করে বলেই ফেললেন,—কিন্তু তোমার মা যে বলছিলেন...

—মা বলেছে? কী বলেছে?

—তোমার দাদার ছেলেরা নাকি তন্ময়কে খুব টিজ-ফিজ করত!

—হ্যাঁ, সেটাও একটা কারণ। নরমাল ছেলেমেয়ের সঙ্গে আমার অ্যাবনরমাল ছেলের থাকা সত্যিই খুব মুশকিল। মালবিকার ঠোঁটে একটা ম্রিয়মাণ হাসি ফুটল,—বুল্টু-ছুল্টুর কী দোষ, ওরা ছেলেমানুষ, ওসব কী আর বুঝে করে? কিন্তু বড়রা? মা-দাদা নয়, বউদি। বিশ্বাস করুন, নিজের চোখে আমি সে দৃশ্য দেখেছি।...আমার বাবুর তেড়াবেঁকা হাঁটা, জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলার চেষ্টা ক্যারিকেচার করে দেখাচ্ছে বুল্টু, আর আমার বউদি হাসিতে লুটিয়ে পড়ছে! মাকে বললাম, মা বলল চোখ বুজে থাক, মেনে নে! বলুন, এ কি সম্ভব! কোনও মা পারে? তার চেয়ে আমার জড়বুদ্ধি ছেলে নিয়ে আলাদা থাকাই কি ভালো নয়? একবার মনে মনে ভেবেছিলাম, ওটা তো আমার বাবার বাড়ি, ওখানে আমারও রাইট আছে, পার্টিশান করে নিয়ে ভিন্ন হয়ে থাকি। তারপর মনে হলো, থাক, এতে অশান্তিই বাড়বে।

শুভময় বললেন,—তবে তোমার মার কথা শুনে মনে হল, তিনি কিন্তু তোমায় নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় থাকেন।

—সে কি আমি বুঝি না? আমিও তো মা। তবে মাকে আমি বলে দিয়েছি, এসো যখন খুশি, টেলিফোন করে খোঁজখবর নাও...। কিন্তু একটু দূরে দূরে থাকো। তফাতে আছি বলে দাদা-বউদির সঙ্গে সম্পর্কটাও আর নতুন করে তেতো হয়নি। বলুন, এটাই ঠিক ডিসিশান হয়েছে না?

মালবিকা কোন কাজটা ঠিক করেছে, কোনটাই বা বেঠিক, শুভময় বিচার করার কে? তবে একটা কথা টের পাচ্ছেন, মেয়েটাকে যত একা ভেবেছিলেন মেয়েটা তার চেয়েও বেশি একা। হয়তো বা শুভময়ের চেয়েও বেশি। শুভময়ের তাও পরমাকে ঘিরে কিছু মধুর স্মৃতি আছে। ওই স্মৃতিই তো শুভময়ের সঙ্গী এখন। মালবিকার তাও নেই। আহা রে।

কথার ঘোর থেকে নিজেকে টেনে তুলেছে মালবিকা। উঠে আলো জ্বেলে দিল ঘরের। ঘড়ি দেখল। তন্ময়কে একটা ওষুধ খাওয়ানোর সময় হয়েছে, চেঁচিয়ে সুমতিকে বলল জল দিয়ে যেতে। গ্লাস হাতে ছেলের মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ডাকল,—বাবু? বাবুসোনা?

তন্ময় ঘোলাটে চোখ খুলে তাকিয়েছে।

—ওষুধটা খেয়ে নাও তো সোনা। হাঁ করো।

ক্যাপসুল গিলতে কষ্ট হয় তন্ময়ের। পিঠে হাত দিয়ে তাকে খানিকটা ওঠাল

মালবিকা। ওষুধটা খাওয়াল সাবধানে। আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিল ছেলের মুখ। ফের শুইয়ে দিয়ে বলল,—ঘুমোও আবার। চোখ বোজো।

তন্ময় সত্যিই ভাবী দুর্বল হয়েছে। চোখ খুলে রাখার ক্ষমতাই নেই।

সুমতির হাতে গ্লাস ফেরত দিয়ে মালবিকা বলল,—তোর রান্নাবান্না কদ্দূর?

—মুরগির মাংস হয়ে গেছে। ফিশফ্রাই গড়ে রেখেছি। খাওয়ার আগে ফ্রায়েড রাইসটা করব।

শুভময় হাঁ হাঁ করে উঠলেন,—এ কী? এত সব করেছ কেন? ছেলেটার শরীর খারাপ...!

—ছেলেটার জন্মদিনে অনেকদিন পর কাউকে খাইয়ে আমি সুখ পাচ্ছি। মালবিকার মুখে ভাঙা হাসি, — আজ অন্তত আমায় এই সুখটুকু পেতে দিন।

সাত

... ডিয়ার বাবা, আশা করি ভালো আছ। তোমার পাঠানো ব্যাংকড্রাফ্‌ট আজই পেলাম। থ্যাংক ইউ। টাকাটা কিন্তু আমি লোন হিসেবেই নিচ্ছি। নেক্সট উইকে ফ্ল্যাটের বুকিংটা সেরে ফেলব...

বৈদ্যুতিন পত্রটি পড়ছিলেন শুভময়। রোমান হরফে লেখা বাংলা চিঠি। অবশ্য বাংলার চেয়ে ইংরিজি শব্দই বেশি। অন্য দিন বাবুল দু'লাইনে সারে, আজ চিঠি বেশ বড়ই লিখেছে। টাকার মহিমা? ছেলের সম্পর্কে এ ধরনের কথা ভাবতেও খারাপ লাগে।

শুভময় কম্পিউটারের পরদায় চোখ রাখলেন আবার।...এ বছর পুজোয় আমরা ক্যালকাটায় যাব ডিসাইড করেছি। টু উইকস্ থাকব। তুমি তো আমাদের সঙ্গে চলে আসতে পারো ও সময়ে। অক্টোবর-নভেম্বর টাইমটাও ভালো, পুনেতে তখন ঠাণ্ডাটাও তোমার পক্ষে বেয়ারেবল্। এক-দু'মাস তুমি ভালোই এনজয় করবে। এখানে এখন হেভি বৃষ্টি হচ্ছে। কলকাতায় এখন বর্ষার কী হাল? মাঝে নাকি ডুবে গেছিল? ভালো থেকো।

চিঠিটা পড়তে পড়তে শুভময় হেসে ফেললেন। ফোন করেও তো কথা বলতে পারে বাবুল। করে না। বেশিরভাগ সময়ই ই-মেল পাঠায়। খরচ কম পড়ে বলে? ছেলের গলা শুনতে বাবার যে বেশি ভালো লাগে, এ কথাও কি ভাবে না একবার? শুভময়ও হয়েছেন তেমনি। কেন যে বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি সত্যিগুলোকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন! বাবুল বোধহয় শেষ ফোন করেছিল গত মাসের শেষে।

আরও কয়েকটা চিঠি আছে মেলবক্সে। এই ফিনান্স সার্ভিস, ওই ট্রাভেল এজেন্সি...। ওই সব চিঠি শুভময় খোলেন না বড় একটা, আজ দেখছিলেন আলগাভাবে।

জগন্নাথ ঘরে ঢুকেছে। অভিভাবকের সুরে বলল,—এখন আবার কম্পিউটার খুলে বসলেন? শুয়ে পড়ুন। আমি কিন্তু আপনার মশারি টাঙিয়ে দিয়েছি।

—এত তাড়াতাড়ি?

—কোথায় তাড়াতাড়ি! সওয়া দশটা বাজে। আপনি তো ফিরলেনেই নটার পর।

—কী করব, খেয়ে প্রায় নড়তেই পারছিলাম না। শুভময় ইন্টারনেট অফ করলেন। কম্পিউটারকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে বললেন,—এখনও পেট আইঢাই করছে।

—অম্বলের ওষুধ দেব?

—দে একটা। চিবোই।

জগন্নাথ ট্যাবলেট এনে দিল। মুখে পুরে শুভময় উঠলেন চেয়ার ছেড়ে। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বললেন,—তোর দাদা তো একটা মুশকিল আসান করে দিয়েছে রে।

জগন্নাথ বুঝল না। চোখ পিটপিট করছে।

—দাদারা পুজোয় আসছে। ফেরার সময়ে আমায় সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। ওখানে দুটো মাস বডি ফেলে দিতে পারলে তুই নিশ্চিন্তে বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বসতে পারবি।

—আপনি যাবেন?

—দেখি। ভাবি।

জগন্নাথ ফিক করে হাসল,—আপনি অন্য কোথাও গিয়ে দু'মাস থাকতেই পারবেন না।

—না পারার কী আছে!

—আপনাকে কি চিনি না? কোথাও গিয়ে থাকেন আপনি?

—খুব চিনেছিস তো আমাকে! শুভময় হেসে ফেললেন,—জলের জগটা খাটের পাশে সাইড টেবিলে রেখে দিস। যা।...আর হ্যাঁ, বলরাম কি চলে গেছে?

—দাদা কাল যাবে।

—অ। ওকে কিন্তু তুই জোর দিয়ে বলবি, বিয়ের পর তোরা জোড়ে ফিরবি।

জগন্নাথ মাথা নেড়ে চলে গেল।

ক্ষণপূর্বের হাসিটুকু লেগে রয়েছে শুভময়ের ঠোঁটে। সত্যি, কেন যে এ বাড়ি ছেড়ে এক পা'ও নড়তে ইচ্ছে করে না? বিশেষত পরমা চলে যাওয়ার পর। পরমা কি ভূত হয়ে বিচরণ করছে এ বাড়িতে? অদৃশ্য সুতোয় বেঁধে রাখছে শুভময়কে?

শোওয়ার আগে শুভময় অভ্যেস মতো বাথরুমে গেলেন একবার। প্রস্টেটের সমস্যা হচ্ছে ইদানীং, রাত্রে আরও দু-একবার উঠতে হয়। বাথরুম থেকে শুনতে পেলেন টেলিফোন বাজছে। যথা শীঘ্র সম্ভব বেরিয়ে এসে দেখলেন জগন্নাথ তুলেছে ফোন। রিসিভার বাড়িয়ে দিয়ে বলল,—জামাইবাবু।

শুভময় গলা ঝাড়লেন,—কী ব্যাপার অনুপম? এত রাতে?

ও প্রান্তে অনুপমের বিনয়ী কণ্ঠস্বর,—শুয়ে পড়েছিলেন?

—তোড়জোড় করছিলাম।

—সরি টু ডিসটার্ব ইউ। আসলে একটা দরকারে...তেমন আরজেন্ট কিছু নয় অবশ্য।

—অত সংকুচিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। রাত এখনও এমন কিছু হয়নি, বলে ফেলতে পারো।

—আপনি তো স্টেট্সম্যান রাখেন, তাই না?

—হ্যাঁ। কেন?

—গত সোমবার স্টেট্সম্যানে একটা সাপ্লিমেন্টারি বেরিয়েছিল। সফ্টওয়্যার ইন্‌ডাস্ট্রির ওপরে। কাগজটা যদি একটু আলাদা করে রাখেন...

—নো প্রবলেম। জগন্নাথ গুছিয়েই রাখে। তোমাদের খবর কী?

—চলছে। মার একটু কাশি মতন হয়েছে, পুচকুনও নাক টানছে...

—আর তোমার বাবা? চোখ অপারেশানের কথা চলছিল না?

—ঝিমলি তো বলছে অগাস্টেই করিয়ে নেবে। আমার একটু বাইরে যাওয়ার কথা চলছে, তার আগেই।

—তুমি আবার বাইরে ...? কই, ঝিমলি তো বলেনি!

—মিস্ করে গেছে বোধহয়।

—যাচ্ছ কোথায়?

—টোকিও। মাস আষ্টেকের প্রজেক্ট, হয়তো আরও দু-চার মাস এক্সটেন্ডও হতে পারে।

—তার মানে প্রায় বছর খানেকের ধাক্কা?

—কী আর করা যাবে! পাপী পেট-কা সওয়াল। আপনার শরীর ভালো তো?

—ফাইন। ঝিমলি কী করছে? পুচকুন?

—পুচকুন ঘুমিয়েছে। ওকে তো কাঁটায় কাঁটায় নটায় বিছানায় পাঠিয়ে দেয় ঝিমলি। নিজে বোধহয় কী সব ড্রয়িং-টয়িং করছে কম্পিউটারে। বলছিল শুতে রাত হবে। দেব ফোন?

—থাক, কাজের মেয়ে কাজ করুক। তোমার কাগজ আমি ঝিমলি এলে পাঠিয়ে দেব।

টেলিফোন ছেড়ে শোওয়ার ঘরে এলেন শুভময়। আজ একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আছে, ফ্যানটা কমিয়ে দিলেন দু'পয়েন্ট। বিছানায় ঢুকতে ঢুকতে শুভময় মেয়ে জামাই-এর কথাই ভাবছিলেন। কী বিচিত্র দাম্পত্য জীবন! জার্মানিতে সাত মাস কাটিয়ে এই তো ফেব্রুয়ারিতে ফিরল অনুপম, আবার ছুটছে জাপান। ঝিমলিও নিজের কাজে দৌড়চ্ছে সারাদিন। এত দৌড়ঝাঁপ কিসের জন্য, যদি না একটু থিতু হয়ে পারিবারিক সুখ উপলব্ধি করা যায়? রোজগারের জন্য বেঁচে থাকা? না বেঁচে থাকার জন্য রোজগার? এই যে ওরা দুজনে দুজনকে নিজেদের সময় মতো পায় না, এর জন্য কি কোনও অভাববোধ আছে কারুর ভেতরে? মনে তো হয় না।

মশারির ভেতর থেকে শুভময় দেওয়ালের দিকে তাকালেন। একটা বড়সড় ছবি ঝুলছে পরমার। যুবতী পরমাও নয়, বৃদ্ধা পরমাও নয়, বছর চল্লিশেকের মধ্যবয়সী হাস্যমুখ পরমা। বাবুলের বারো বছরের জন্মদিনে তোলা ফোটো। ভরাট

মুখ পরমা নিষ্পলক তাকিয়ে আছেন শুভময়ের দিকে। ডাগর ডাগর চোখ, সামান্য কোঁকড়ানো চুল, পান পাতা মুখ, পাতলা ঠোঁট, ছোট্ট কপালে লাল টিপ, সিঁথিতে সিঁদুর—জালের ওপারে আবছা হয়ে আসা ওই ছবি এখনও বুকে ঢেউ জাগায়। পরমার মুখে ভারী সুন্দর একটা সুখ লেপে আছে। ঝিমলির সঙ্গে পরমার মুখের আদলে কত মিল, অথচ দুজনে একেবারেই আলাদা। তফাতটা কি সময়ের?

শোওয়ার আগে পরমার ছবির দিকে তাকালে পরমা বড় বেশি ঘুরে ফিরে আসে স্বপ্নে, শুভময়ের রাতটাকে আরও নিঃসঙ্গ করে দেয়। বেডসুইচ টিপে শুভময় বাতি নিবিয়ে দিলেন। চোখ বুজেছেন।

বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। গাঢ় অন্ধকারে বারি পতনের শব্দ শোনা যায়। একঘেয়ে। একটানা। পাশ ফিরতেই বিকেলের দৃশ্যটা চোখে ভেসে উঠল। মাথা নিচু করে বেরিয়ে যাচ্ছে সুব্রত। ছেলেটা কি সত্যিই শয়তান? কোর্টের ভয় দেখায়, আবার টাকা দিতেও আসে, এ কেমন ধারার মানুষ? কে জানে, মালবিকা-তন্ময়কে ছেড়ে অন্য জীবন শুরু করার পর আবার তারাই মূল্যবান হয়ে উঠেছে সুব্রতর কাছে। দূরের ঘাস তো সব সময়েই ঘন দেখায়, নয় কি? মালবিকা যে সুব্রতর টাকা ছুঁতে ঘৃণা বোধ করবে, এ তো স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে সুব্রতও যে একটা অনুতাপে পুড়ছে, এও কিন্তু তার মুখ-চোখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়। বেশ হয়েছে। মালবিকার মতো মেয়েকে কষ্ট দেওয়ার জন্য এ শাস্তিটা ওর প্রাপ্য।

ভাবতে ভাবতে ঘুম নেমেছে শুভময়ের চোখে।

আজকাল শুভময়ের নিদ্রা তেমন গাঢ় হয় না। পাতলা ঘুমে এক আজব স্বপ্ন দেখছিলেন শুভময়। তাঁকে ডাইনিং টেবিলে খেতে দিয়েছেন পরমা। কত কী রান্না করেছেন, সার সার বাটি সাজানো। হাতায় করে পরমা ফ্রায়েড রাইস দিচ্ছেন প্লেটে, শুভময় তাঁর হাত চেপে ধরলেন, আর দিও না। এ কী, পরমার মুখ মালবিকায় বদলে গেল কেন? দেওয়ালে বাঁধানো পরমার ছবির মতো মুখ টিপে হাসছে মালবিকা! চোখটাও যেন কেমন কেমন! দৃষ্টিতে কৌতুক? না আমন্ত্রণ? কেন মালবিকা হাত ছাড়িয়ে নিচ্ছে না?

আচমকা এক জোরালো চিৎকারে শুভময়ের ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে আলো জ্বেলেছেন। দরজায় জগন্নাথ।

—কী রে, ডাকাত পড়েছে নাকি?

—সুমতি এসেছে। ও বাড়ির দিদি আপনাকে এক্ষুনি ডাকছে। ছেলেটার অবস্থা নাকি ভালো না।

পলকের জন্য শুভময়ের হৃৎপিণ্ড নিশ্চল যেন। স্নায়ু শিথিল সহসা। কাঁপছেন, নিজের অজান্তেই।

আট

এমন এক ভয়ংকর বিপর্যয়ের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না শুভময়। নার্সিংহোমে একান্ন ঘণ্টা যমে-মানুষে টানাটানির পর আজ মারা গেল তন্ময়। ভোরবেলা। পাঁচটা দশে।

নাহ্, সত্যিই শুভময় এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না। এ কী করে সম্ভব? ইন্‌টেনসিভ কেয়ারে ছিল বটে, কিন্তু কাল সন্ধেবেলাও তো ডাক্তার বললেন অবস্থা ক্রমশ উন্নতির দিকে! ওষুধে কাজ হচ্ছে, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অনেকটা স্বাভাবিক, পাল্‌স বিট বেড়েছে, মালবিকাকে দেখে নাকি কাল চিলতে হাসিও ফুটেছিল তন্ময়ের মুখে! সেই ছেলে ভোরবেলা নিঃসাড়ে চলে গেল?

একের পর এক ছবি ফুটে উঠছিল শুভময়ের চোখে। চলমান দৃশ্যাবলী। সেদিন গভীর রাতে পড়িমরি করে পৌঁছলেন মালবিকার বাড়ি। মালবিকা ঘরে ছটফট করছিল, তাঁকে দেখে আলুথালুভাবে দৌড়ে এল,—বাবুকে এক্ষুনি হসপিটালাইজ করতে হবে।

—এই তো দেখে গেলাম ঘুমোচ্ছে, কী হয়ে গেল হঠাৎ?

—হাতের আঙুলগুলো দেখুন, নীল হয়ে গেছে! কী সাংঘাতিক হাঁপাচ্ছে! চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে!

—কখন থেকে হল?

—আপনি চলে যাওয়ার পর ওর ঘুমটা একটু ভেঙেছিল, তখন একটু পায়েস খাওয়ালাম। তার পরেই ভয়ানক শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেল...। সুমতি বিমানডাক্তারকে ডেকে আনল। উনি বললেন অ্যাকিউট লাং কনজেশান থেকে হার্টে কোনও ব্লকেজ ডেভেলাপ করেছে, এক্ষুনি রিমুভ করতে হবে।

শুভময় ব্যস্তভাবে বললেন,—তাহলে তো এক্ষুনি অ্যাম্বুলেন্স কল করতে হয়।

---ডাক্তারবাবু ছিলেন এতক্ষণ। উনিই নিজের মোবাইল থেকে...। এসে পড়বে অ্যাম্বুলেন্স।

কতক্ষণ সময় লেগেছিল অ্যাম্বুলেন্স আসতে? বড় জোর পনেরো-বিশ মিনিট। ওইটুকু সময়কে যেন অনন্তকাল মনে হচ্ছিল।

তারপর?

তারপর তো নার্সিংহোম। এমারজেন্সি। সেখান থেকে স্ট্রেচারে সোজা আই-

সি-ইউতে চলে গেল তন্ময়। হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছে মালবিকা, পাশে শুভময়। মালবিকা শুভময়ের হাত চেপে ধরল,—কী হবে এখন?

আশ্চর্য, ওই রকম একটা মুহূর্তেও খানিক আগে দেখা স্বপ্নটা শুভময়ের মনে পড়ে গেল। আরও আশ্চর্য, কোনও কারণ ছাড়াই সেই মুহূর্তে এক অদ্ভুত অপরাধবোধে ছেয়ে গেল বুকটা। যেন ওরকম একটা স্বপ্ন দেখার জন্যই তন্ময়...

ঘড়ঘড়ে গলায় শুভময় যেন নিজেকেই বললেন,—ভেঙে পোড়ো না। মনকে শক্ত রাখো।

একতলার ওয়েটিং হলে গিয়ে বসল মালবিকা। অস্থির পায়ে শুভময় পায়চারি করছেন নার্সিংহোমের বাইরেটায়। রাত কত হবে তখন? আড়াইটে? তিনটে? কলকাতার রাত্রি কী ভীষণ নির্জন তখন। মেঘ সরে গিয়ে দুটো-চারটে তারা ফুটেছিল আকাশে, মলিন ভাবে জ্বলছিল। কেমন এক সোঁদা গন্ধ যেন লেগে ছিল রাত্রির গায়ে। হঠাৎ হঠাৎ রাস্তা মাড়িয়ে ছুটে যায় গাড়ি, কুকুরের পাল ডেকে ওঠে থেকে থেকে, ছিঁড়ে খানখান হয়ে যায় নির্জনতার ঘোর। আবার ঝিমোয় রাত। একা একা পায়চারি করতে করতে শুভময়ের মনে হচ্ছিল এই রাত বুঝি অন্তহীন, ভোর আর আসবেই না।

অবশেষে এল ভোর। ধুঁকতে ধুঁকতে। কাঁপতে কাঁপতে।

আবার আলো। আবার শব্দ। মানুষ। ব্যস্ততা। কলরব। হাসপাতালসদৃশ প্রকাণ্ড নার্সিংহোমে ডাক্তার-নার্সদের পেশাদার আনাগোনা। তার মধ্যে বেলা বাড়লে একবার বাড়ি ঘুরে এলেন শুভময়। ব্যাংকেও গেলেন। মালবিকার কাছে কত কী আছে কে জানে, কিছু টাকা তুলে রাখা ভালো। টেলিফোনও করলেন দু-এক জায়গায়। মালবিকার বাপের বাড়িতে। অফিসে। মুমূর্ষু ছেলের আরোগ্যের আশায় হাসপাতাল নার্সিংহোমে একা বসে থাকা বড় দুঃসহ, এ সময়ে লোকবল কিছুটা হলেও তো ভরসা বাড়ায়।

তা পরশুই এসে গেছিল সবাই। মালবিকার দাদা-বউদি, গুটিকয়েক আত্মীয়, অফিসের বন্ধুবান্ধব। কোথথেকে খবর পেয়েছে কে জানে, বিকেলে সুব্রতও এসে হাজির। সেও ভার মুখে প্রহর গুনছে। তন্ময়ের ফুসফুস থেকে পাম্প করে অনেকখানি শ্লেষ্মা বার করা হল, রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক হল ক্রমশ, হার্ট ফেলিওরের প্রবণতাও বাগে এল ধীরে ধীরে। অশক্ত শরীরেও ব্যাধির সঙ্গে জোর যুঝছে দুর্বল ছেলেটা, এরকমই তো শোনা যাচ্ছিল বার বার। তার পরেও কী করে সব বিফলে চলে যায়?

দুঃসংবাদটা শুভময় পেয়েছেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। মালবিকার দাদা নার্সিংহোমে রাত জাগছিল, সেই করেছিল ফোনটা। শুনে প্রথমটা মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ অসাড়।

বেরোনোর আগে জগন্নাথ চায়ের সঙ্গে মাখন টোস্ট করে দিয়েছিল, নামল না গলা দিয়ে, ট্যাক্সি ধরে সোজা নার্সিংহোম। পৌঁছে দেখলেন মালবিকা পাথর হয়ে বসে ওয়েটিং রুমে। পাশে, দুটো সিট পরে সুব্রত। মধ্যিখানে বসলেন শুভময়, তাঁকে যেন দেখতেই পেল না মালবিকা। তার দৃষ্টি শূন্য। নিষ্পলক।

একে একে আসতে শুরু করেছে লোকজন। নিচু স্বরে কথা বলছে টুকটাক। পায়ে পায়ে বেরিয়ে এলেন শুভময়, দাঁড়িয়েছেন খোলা আকাশের নীচে। গত দু'দিন বৃষ্টি হয়নি তেমন, আজ আবার সকাল থেকে আকাশ ভারী হয়ে আছে। বাতাস বইছে অল্প অল্প। শিরশিরে। ভেজা ভেজা। নার্সিংহোম চত্বরে একটা কদমগাছ ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে। খসে পড়া কদমফুলে ছেয়ে আছে গাছতলা।

শুভময়ের বুকটা টনটন করে উঠল সহসা। এত ফুল পড়ে আছে দেখলে তন্ময় বড্ড খুশি হতো, মুঠো করা হাত নেড়ে নেড়ে ফুলগুলো কুড়িয়ে দিতে বলত শুভময়কে। ওফ্, ছেলেটা আর কোনও দিন ফুল চাইবে না!

মালবিকার দাদা হন্তদন্ত হয়ে আসছে এদিকে। সামনে এসে বলল,—কাউন্টারে কথা বলে এলাম। ওরা সাড়ে নটা নাগাদ বডি দেবে।

শুভময় ফ্যালফ্যাল চোখে তাকালেন,—বডি...?

—হ্যাঁ। ওরা বলল আফটার এক্সপায়ারি চার ঘণ্টা নাকি ওয়েট করা নিয়ম।

—ও।

—অফিসের বিল-টিলগুলো তৈরি হয়ে গেছে, আমি পেমেন্টটা করে আসি। ...তার পরেও কিছু প্যারাফারনেলিয়া আছে...গাড়ি আনা...ছেলেটাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে নিয়ে যাওয়া...ভাবছি গোল্ডেন পার্কে আর নিয়ে যাব না, সোজা আমাদের বাড়িতে গিয়ে মাকে একবার দেখিয়ে...

শুভময়ের বুকের ব্যথাটা যেন বেড়ে গেল। এসব কথা কি তাঁকে না শোনালেই নয়!

মালবিকার দাদা হঠাৎই শুভময়ের হাত চেপে ধরেছে। কাতর গলায় বলল,—আপনাকে যে একটা অপ্রিয় কাজ করতে হবে এখন।

কাজটা কী জিজ্ঞেস করতে পারলেন না শুভময়, গলা দিয়ে শুধু একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরিয়ে এল।

—মিলুকে তো আমরা কেউ নড়াতে পারছি না...আপনি যদি একটু ভুলিয়ে ভালিয়ে সরিয়ে নিয়ে যান...মানে যদি বাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারেন...

—আমি?

—আপনি ছাড়া কেউ পারবে না। প্লিজ, আপনি গিয়ে একবার বলুন।

এই ভয়ংকর দায়িত্বটা শুভময়কে পালন করতে হবে?

বুকে চাপ চাপ ব্যথা, পা যেন আর চলতে চাইছে না, তবু নিজেকে টেনে নিয়ে গিয়ে শুভময় দাঁড় করালেন মালবিকার সামনে। মৃদু স্বরে বললেন,—মালবিকা, ওঠো।

মালবিকা শুনতে পেল কি? কোনও প্রতিক্রিয়া নেই।

শুভময় আবার বললেন,—ওঠো মালবিকা। এবার তো যেতে হবে।

খটখটে শুকনো দুটো চোখ তুলল মালবিকা। একটুক্ষণ তাকিয়ে দেখল শুভময়কে। আচমকা আঁকড়ে ধরেছে শুভময়ের হাত। ডুকরে উঠল,—কোথায় যাব? কেন যাব?

পরমার মৃত্যুর পর এই প্রশ্ন তো শুভময়কেও আলোড়িত করেছে। কেন যাবেন? কোথায় যাবেন?

শুভময় কেঁপে উঠলেন। আশ্চর্য মানুষের মন, এই সময়েই কেন যে ফের মনে পড়ল তন্ময় যখন প্রবল শ্বাসকষ্টে ছটফট করছে, তখনি তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন! তাঁর হাত চেপে ধরে আছে মালবিকা!

এই মুহূর্তে মালবিকা তাঁর হাত চেপে ধরেছে বলেই কি স্বপ্নটার কথা মনে পড়ল?

শরীরে একটা অন্য অনুভূতি টের পাচ্ছিলেন শুভময়। এ শোক নয়, দুঃখ নয়, এ একেবারে অন্যরকম।

শুভময়ের বুকের কষ্টটা আরও বেড়ে গেল সহসা।

নয়

মালবিকার সঙ্গে শুভময়ের আর একবার মাত্র দেখা হয়েছিল। তন্ময়ের মৃত্যুর মাসখানেক পর।

সেদিন নার্সিংহোম থেকে ফেরার পরই ভালোরকম বিছানায় পড়ে গেছিলেন শুভময়। বুকে ব্যথা তো ছিলই, সঙ্গে ঘাড়ে যন্ত্রণা। লক্ষণ ভালো নয় অনুমান করে হাঁকপাঁক করে ডাক্তার ডেকে এনেছিল জগন্নাথ। খবর পেয়ে ঝিমলিও এসে গেল। ডাক্তার অবশ্য বলল ভয়ের কিছু নেই, ইসকিমিক পেইন, হঠাৎ স্নায়ুর চাপে ব্লাড প্রেশারটাও চড়ে গেছে, এখন বেশ কিছুদিন পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন।

প্রথম পাঁচ-সাত দিন শুভময় সত্যি সত্যিই শুয়ে রইলেন। তারপর থেকে হাঁটাচলা করছেন অল্পস্বল্প। বাড়ির ভেতরেই। মর্নিং ওয়াকের তো প্রশ্নই নেই, বেশি সিঁড়ি ভাঙা বারণ বলে একতলাতেও নামছেন না বড় একটা। কচিৎ কখনও টিভি দেখেন, কি কম্পিউটারে বসেন। দিনের অধিকাংশ সময়ই তাঁর কাটে বারান্দার ইজিচেয়ারে। হয়তো বা বই পড়ছেন কখনও, কিংবা হয়তো কাগজ উল্টোচ্ছেন। নয়তো বা শুধুই তাকিয়ে আছেন ফাঁকা চোখে।

ঝিমলি অবশ্য এখন প্রায় রোজই টুঁ মারে এ বাড়িতে। যদি বা কোনও কারণে একদিন আসা না হল, অন্তত সাতবার ফোন তো করবেই। বাবাকে সে কড়া নিয়মে রেখেছে। মাঝখান থেকে জগন্নাথেরই হয়েছে ফ্যাসাদ, প্রতিদিনই কোনও না কোনও কারণে ঝিমলির একপ্রস্থ বকুনি তার জন্য বাঁধা। বাবার মন ভালো করার জন্য পুচকুনকেও সে এর মধ্যে নিয়ে এল কয়েকবার। অনুপমও এক রবিবার এসে প্রচুর ভোকাল টনিক দিয়ে গেল শ্বশুরমশাইকে। সত্তর বছরের বৃদ্ধকে বুঝিয়ে গেল, জীবন অনিত্য, কোনও মৃত্যুতেই ভেঙে পড়তে নেই। বাবার শরীর খারাপের খবরে বাবুল-শ্বেতাও রীতিমতো উদ্বিগ্ন, তারা ফোন করছে ঘন ঘন। বাবাকে এবার পুজোর পর তারা পুনেতে নিয়ে যাবেই।

মালবিকা এল এক বিকেলে। দিনটা ছিল সম্ভবত শনিবার। শুভময় জোর চমকেছিলেন। প্রথমটা তো কথাই খুঁজে পাচ্ছিলেন না। মালবিকাও তথৈবচ। মাথা নিচু করে বসে আছে তো বসেই আছে।

একসময়ে মালবিকাই কথা শুরু করল,—আপনার শুনলাম খুব শরীর খারাপ?

—এখন ভালো। তুমি কেমন আছ? বলেই শুভময়ের মনে হল এ প্রশ্ন করার

কোনও অর্থই হয় না। কথা ঘুরিয়ে বললেন,—অফিস জয়েন করেছ?

—বাড়িতে বসে থেকেই বা আর কী করব!

—কোথায় আছ? এখানে? না এখনও দাদার বাড়িতে?

আবার মালবিকা চুপ। আবার মাথা নিচু।

সরাসরি মালবিকাকে দেখতে অস্বস্তি হচ্ছিল শুভময়ের। তবু নজর করলেন মালবিকা আরও রোগা হয়ে গেছে। চোখ দুটো বসা বসা, কালি মাখানো।

শুভময় বললেন,—গত সপ্তাহে জগন্নাথকে পাঠিয়ে তোমার খোঁজ করেছিলাম। তখনও তুমি আসোনি।

মুখ তুলল মালবিকা। শুভময়ের চোখে চোখ রেখেও দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছে,—এ বাড়িতে আমি আর ফিরতে পারব না।

—তার মানে পারমানেন্টলি রিজেন্ট পার্ক?

—দেখি। ভাবছি ট্রান্সফার নিয়ে কলকাতার বাইরে চলে যাব। মালবিকার গলা ধরে এল,— কেন আর এখানে থাকব বলুন? কার জন্য থাকব?

শুভময় মনে মনে বললেন,—আমি তো আছি। আমার জন্য কি তুমি থাকতে পারো না মালবিকা? দুটো একা মানুষ পরস্পরের মুখোমুখি বসে থাকলেও তো খানিকটা কষ্ট লাঘব হয়।

মুখে বললেন,—দ্যাখো যদি বাইরে কোথাও গিয়ে শান্তি পাও, তাই থাকো।

আরও একটুক্ষণ নীরব বসে থেকে উঠে পড়ল মালবিকা। মৃদু স্বরে বলল,—সাবধানে থাকবেন।

শুভময় বলতে চাইলেন,—যেও না মালবিকা। কাছে থাকো।

শুভময়ের স্বর বলল,—এসো।

শরতের বিকেলটা মাড়িয়ে মন্থর পায়ে চলে গেল মালবিকা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে যতক্ষণ চোখ যায় তাকিয়ে তাকিয়ে মালবিকাকে দেখলেন শুভময়।

ইজিচেয়ারে ফিরে শুভময় একটা লম্বা শ্বাস ফেললেন। টের পাচ্ছিলেন এবার শীত আসছে। হিমেল। ভয়ংকর।

প্রতিবারের মতোই কাউন্টারের সামনে এসে চোখ থেকে সানগ্লাস নামাল তাপস। প্রতিবারের মতোই ঝুঁকল সামান্য। বলল,—ডবলবেড রুম।

রিসেপশানে গতবারের লোকটাই বসে আছে। কালো মতন, বেঁটে, গোলগাল মুখ। চোখ নিষ্প্রাণ কাতলা মাছের মতো। তাপসকে চিনলেও হাবেভাবে কখনই প্রকাশ করবে না। পেশাদারিত্ব।

ভাবলেশহীন গলায় লোকটা পাল্টা প্রশ্ন করল,—এসি? না নন-এসি?

—এসি'ই দিন।

তাপস রুমালে ঘাড় মুছল। ফাল্গুন মাস চলছে, এখনও তেমন গরম পড়েনি, ঠাণ্ডা ঘর না হলেও চলত। তবে গাড়ি চালিয়ে আসার সময়ে রোদের ঝাঁঝ ভালোই ছিল, ঘরে এখন একটা হিমেল ভাবও মন্দ লাগবে না। আমেজ আসবে।

লোকটা জাবদা খাতা বাড়িয়ে দিয়েছে। অভ্যস্ত হাতে নাম-ধাম লিখল তাপস। রাত্রির সঙ্গে বেরিয়ে কখনই কোনও হোটেলে সে তার আসল নাম ব্যবহার করে না, শেষের এস্ অক্ষরটা বদলে এন্ করে দেয়। ব্যস্, তাপস থেকে তপন। অনেকটাই ফারাক, আবার মূলের কাছাকাছিও থাকা হল। এটুকু মিথ্যেয় দোষ নেই।

রুটিন কাজটুকু শেষ করে ঘুরল তাপস। হাত তিনেক তফাতে দাঁড়িয়ে আছে রাত্রি। চোখ অন্যত্র, বাইরের রাস্তায়। নাকি রাস্তার ওপারে? নদীতে? রাত্রি যে নদী দেখে কী সুখ পায়!

তাপস ডাকল,—অ্যাই, এসো।

একটু যেন চমকে ফিরল রাত্রি। নিঃশব্দে হাঁটছে তাপসের পাশে পাশে। চেনা বেয়ারার পিছু পিছু। তাপসের মনে হল রাত্রি যেন আজ বড্ড বেশি চুপচাপ। গোটাটা পথ গাড়িতে কটাই বা কথা বলেছে! তাপসের প্রশ্নের উত্তরে শুধু হুঁ-

হ্যাঁ-তেই কাজ সারছিল। অন্য দিন যে দারুণ উচ্ছল থাকে তা নয়, তবু গল্প করে টুকটাক। যে শোরুমটায় রাত্রি কাজ করে সেখানে প্রচুর আজব আজব চিড়িয়া আসে, তাদেরই এক-আধটা রসাল কাহিনী শোনায়। কিংবা নিজের হোস্টেলের কথা। কিংবা রাস্তাঘাট, বাসট্রাম। আজ রাত্রিকে কেন যে এমন বোবায় ধরেছে?

অথচ হওয়া উচিত ছিল উল্টোটাই। আজকের বেরোনোটা তো রাত্রিরই ইচ্ছেয়। কাল দুপুরে হঠাৎই অফিসে ফোন,—এই, কাল আমায় একটু বেড়াতে নিয়ে যাবে?

আজ অফিস ডুব মারার খুব একটা স্পৃহা ছিল না তাপসের। কেজরিওয়াল ইন্ডাস্ট্রিজের ফাইলটা এম-ডির ঘরে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়েছে; ভেবেছিল আজ দুপুরে এম-ডির পি-একে ধরে বড়কর্তাকে দিয়ে সিগনেচারটা করিয়ে নেবে। সত্তর লাখ টাকার অর্ডার, অনির্দিষ্টকাল পড়ে থাকলে চলবে? লস তো তাপসেরই। যতীন কেজরিওয়াল পারসেন্টেজ কমিয়ে দিতে পারে। অত জরুরি কাজ ফেলে সে চলে এল, তারপরও যদি রাত্রি হাসিখুশি না থাকে তো ভাল্লাগে!

বেয়ারা দরজা খুলে দিয়েছে। প্রকাণ্ড ঘর। দোতলায়। পরিচিত। আর পাঁচটা সরকারি ট্যুরিস্ট লজের মতোই সুন্দর সাজানো-গোছানো। দেওয়ালে সুদৃশ্য ছবি, মেঝেয় পুরু কার্পেট, ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালে সামনেই বিস্তীর্ণ নদী। এই ঘরটাতেই রাত্রিকে নিয়ে কম করে বার চারেক এল তাপস। বিলাস-মাখা এই কক্ষে ঢুকলে মনটাই কেমন অন্য রকম হয়ে যায়, কলকাতার কেজো জীবনটাকে যেন আর মনেই পড়ে না।

বেয়ারা এসি চালিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাপস সোফায় বসে শ্যু ছাড়ছিল, জিজ্ঞেস করল,—কিছু বলবে?

—লান্চ স্যার ঘরে দেব? নাকি হলে যাবেন?

গতবার এখানে রাত্রির হঠাৎ ডাইনিংহলে গিয়ে খাওয়ার শখ হয়েছিল। ব্যাটা বুঝি মনে রেখে দিয়েছে। তাপস একবার রাত্রির দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল,—নাহ্, ঘরেই দিয়ে যাও। মাটন্।

—না না, চিকেন। রাত্রির মুখে এতক্ষণে কথা ফুটেছে।

—ধুস, চিকেন খাওয়া যায় নাকি! ঘাসের মতো লাগে।

—তা হোক। তোমার না মাটন্ খাওয়া বারণ!

তাপস আর জোরাজুরিতে গেল না, হাত উল্টে দিল। বেয়ারাকে বলল,—একটা বিয়ার দিয়ে যাও তো।

—এক্ষুনি?

—হ্যাঁ, চটপট।

বেয়ারা চলে যেতেই রাত্রি বলে উঠল,—তোমার কি বিয়ার-টিয়ার না খেলেই নয়?

তাপস ভুরু নাচাল,—খেলেই বা ক্ষতি কী?

—ছেলেমানুষের মতো করো কেন? ডাক্তার যেগুলো বারণ করেছে সেগুলো একটু মেনে চললে কী হয়? কোলেস্টেরল বেড়েছে, অ্যালকোহল তো তোমার ছোঁয়াই উচিত নয়।

—তুমিও দেখছি তোমার দিদির মতো শুরু করলে? এটা খেয়ো না, ওটা ছুঁয়ো না, অমুক করবে না, তমুক করবে না......

—পর্ণাদি তো ঠিকই বলে। চল্লিশের পর থেকে একটু রেস্ট্রিকশনে তো থাকাই উচিত।

—অ্যাই, জ্ঞান দিয়ো না তো। ওটা তোমার দিদির ডিপার্টমেন্ট, দিদির ওপরেই ওটা ছেড়ে দাও।.....আরে বাবা, লাইফ তো একটাই। ওয়ান শুড এনজয় ইট টু ইটস ব্রিম। বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়েছে তাপস। সুর করে গেয়ে উঠল,— ভোগ করো কানায় কানায়, ভোগ করো কানায় কানায়, কান দিয়ো না কোনও মানায়, ভোগ করো কানায় কানায়.....

রাত্রির ঠোঁটের কোণে এবার একটা আলগা হাসি উঁকি দিয়েছে। মুখ টিপে বলল,— তোমার বয়স যেন দিন দিন কমছে তাপসদা।

—কমছেই তো। বুড়িয়ে গেলে তোমার মতো অপ্সরী কি আর আমার দিকে ফিরে তাকাবে?

—কেন ঠাট্টা করছ তাপসদা? তুমিও জানো, আমিও জানি, আমি মোটেই সুন্দরী নই।

—সুন্দর দেখার চোখ চাই। আর সেটা আমার আছে। বিছানায় রাত্রির পাশে গিয়ে বসল তাপস। রাত্রির মুখটা ঘুরিয়ে ঠোঁটে আলগা করে চুমু খেল একটা। তৃপ্তি হল না। আবার খেল। আবার। ক্রমশ ঠোঁটে মিশিয়ে দিচ্ছে ঠোঁট। টের পেল রাত্রিও জাগছে একটু একটু করে, দু-হাতে আঁকড়ে ধরেছে তাপসকে।

দরজায় ঠকঠক। বিয়ার এসে গেছে। বোতল নিয়ে বসল তাপস। গ্লাসে পানীয় ঢালতেই রাত্রি উঠে পড়েছে,—তুমি তাহলে এখন ছাইপাঁশ গেলো, আমি স্নানটা সেরে নিই।

—সবে তো এগারোটা বাজে, একটু পরে যেও।

—নাহ্, গা'টা কিচকিচ করছে। পথে যা ধুলো ছিল।

রাত্রি চলে গেছে লাগোয়া বাথরুমে। তাপস বেশ প্রফুল্ল বোধ করছিল। যাক, রাত্রির গুমোট ভাবটা কেটেছে, অনেকটা স্বচ্ছন্দ হয়েছে এখন। মেয়েটার কী যে হয় মাঝে মাঝে? সেবার গাদিয়াড়ায় গিয়ে হঠাৎ মাঝরাতে আবিষ্কার করল রাত্রি পাশে নেই। বাইরে এসে দেখে অন্ধকারে ঝুম হয়ে বসে আছে। কারণ জিজ্ঞেস করতেই

ম্লান হেসে বলল তার নাকি হঠাৎ খুব কান্না পাচ্ছিল, তাই একা একা বারান্দায় বসে...! অথচ সত্যি সত্যি মনখারাপ হওয়ার মতোন কিছু কি ঘটেছিল সে রাতে? দিব্যি তো খুশি খুশি মেজাজে গান গাইল, পাগলির মতো আদর করল, আদর খেল, তারপর হঠাৎ.....?

এখনও যেন মেয়েটাকে পুরোপুরি চিনে উঠতে পারল না তাপস। খানিকটা রহস্য রাখতে পেরেছে বলেই কি রাত্রি এখনও তাকে এতটা টানে? সম্পর্কটা বছর দেড়েক গড়িয়ে যাওয়ার পরও?

অথচ সেভাবে ভাবতে গেলে রাত্রির প্রতি তাপসের সেরকম আকর্ষণ জন্মানোর কথাই নয়। সেই কবে থেকে সে দেখছে রাত্রিকে, পর্ণার সঙ্গে বিয়ের সময়ে বড় জোর দশ-এগারো বছর বয়স ছিল। লিকলিকে রোগা, সরু সরু ঠ্যাং, ঝামর ঝামর চুলের নেহাতই এক বালিকা। সত্যি কথা বলতে কি, পর্ণার এই মাসতুতো বোনটিকে ঠিক শালীও মনে হত না। যেন নিতান্তই কুচোকাচাদের একজন, কারণে-অকারণে যার চুল ঘেঁটে দেওয়া যায়, কান মুলে দেওয়া যায়, কিংবা বায়না জুড়লে চকোলেট লজেন্স কিনে দেওয়া যায় এক-আধটা। কবে থেকে যে বদলে গিয়ে এমন মোহময়ী হয়ে গেল সেই মেয়ে?

ক্যানসারে বাবা মারা যাওয়ার পর অকূল পাথারে পড়েছিল রাত্রিরা। ক্যানসার তো যে সে রোগ নয়, মানুষটাকেই শুধু খায়নি, সংসারটাকেও ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল। ওই চরম দুর্দশার দিনে এগিয়ে গিয়েছিল পর্ণা-তাপসই। কলকাতায় তো কম আত্মীয়স্বজন নেই রাত্রিদের, কেউ সেভাবে দায়িত্ব নেয়নি, পর্ণাই রাত্রিকে কৃষ্ণনগর থেকে নিয়ে এল, রাখল বাড়িতে, ভাই-বোন-মা'র সংসার কোনোক্রমে টেনেটুনে চালানোর মতো একটা কাজও তাপস জোগাড় করে দিল রাত্রিকে। শোরুমের চাকরিতে ক'টাকাই বা মাইনে, তবু তাই পেয়েই রাত্রি যেন বর্তে গেল। কীভাবে তাপসকে খুশি করবে যেন ভেবে পেত না। শোরুম বন্ধ হয় সাতটায়, ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরেই পর্ণাকে হাতে হাতে সাহায্য করতে লেগে যাচ্ছে, মুখের কথা না খসতেই বার বার তাপসকে চা-কফি বানিয়ে খাওয়াচ্ছে, ছুটির দিনে তাপসদার পছন্দসই খাবার বানাতে কোমর বেঁধে ঢুকে পড়ছে রান্নাঘরে, ইস্ত্রি করছে তাপসের জামাকাপড়....।

ওই সময়েই কি তাপস আবিষ্কার করল রাত্রি একজন পরিপূর্ণ নারী হয়ে গেছে?

তারপর সেই দিনটা এল।

এক রোববার বুম্‌বাকে নিয়ে বেরিয়েছিল পর্ণা। বুমবার স্কুলের ফাংশানে। তাপসের সেদিন একটু একটু জ্বর, শুয়ে আছে চাদর মুড়ি দিয়ে। চা নিয়ে এসেছিল রাত্রি, তাপসের কপালে হাত রেখে বোঝার চেষ্টা করছিল টেম্পারেচার আছে কিনা। হঠাৎই তাপসের সব যেন কেমন গণ্ডগোল হয়ে গেল। এতদিনের চেনা শ্যামলারঙ

মেয়েটা যেন একেবারে অন্যরকম আজ! মায়াবী চোখ, পানপাতা মুখ, ভরাট শরীর, পিঠ ছাপিয়ে নেমে আসা এক ঢাল চুল, এ মেয়ে কে? কোমল দৃষ্টিতে এ কী মাদক সম্মোহন?

খপ করে রাত্রির হাত চেপে ধরেছিল তাপস। কাছে টেনেছিল। মুহূর্তের জন্য রাত্রি থমকেছিল কি? ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল? অন্তত ছিটকে সরে যায়নি। শুধু তাপস যখন তপ্ত চুম্বনে ভিজিয়ে দিচ্ছে রাত্রিকে, তখন রাত্রি বুঝি একটু কাঠ কাঠ। সংকোচ? কুমারীর ব্রীড়া? আহত যে হয়নি, সে তো বোঝাই যায়। নইলে ওভাবে শরীর ছেড়ে দিতে পারত না।

সেদিনের পর থেকে রাত্রি অবশ্য এড়িয়ে এড়িয়েই চলত তাপসকে। বুঝি বা পর্ণার চোখে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে। দুম করে পরের সপ্তাহে কৃষ্ণনগর চলে গেল। ফিরে মাস খানেকের মধ্যেই উঠে গেল এন্টালির এক লেডিজ হোস্টেলে। পর্ণা খুব একটা আপত্তি জানায়নি। রাত্রি থাকায় জায়গার একটু সমস্যা হচ্ছিল তো বটেই। বুম্‌বার ঘরে রাত্রি শোয় বটে, কিন্তু বুম্‌বাও তো বড় হচ্ছে, আর দু-বছর বাদে মাধ্যমিক দেবে, মাসি পাকাপাকিভাবে ঘরে ভাগ বসালে তারও তো পরে অসুবিধে হতেই পারে। তার চেয়ে এই তো ভালো। আসবে, যাবে, মাঝেমধ্যে নয় থাকবে দু-চারটে দিন।

তাপস আর পর্ণা গিয়ে হোস্টেলে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল রাত্রিকে। হোস্টেল রেজিস্টারে তাপসই লোকাল গার্জেন। আর সেই সুবাদে সেখানে যখন-তখন যাওয়ার তার অধিকার আছে।

প্রথম দিকে অবশ্য খোঁজ নিতে যায়নি তাপস। একটা চোরা অভিমান কুরে কুরে খাচ্ছিল তাকে। সঙ্গে একটা অপমানবোধও। চলে গেল রাত্রি? তাপসের হৃদয়টাকে বুঝল না? কী ভাবছে। উপকার করেছে বলে সুযোগ নিল তাপসদা? একঘেয়ে হয়ে যাওয়া পর্ণার বাইরে সে যে এক ফালি চাঁদের কিরণ খুঁজছে, এ কথা কি রাত্রির একবারও মনে হল না? ঠিক আছে, তাপসও দেখিয়ে দেবে। ওই কাগজ-কলমের অভিভাবকত্বের তকমাটুকুর বাইরে আর কোনও সম্পর্ক সে রাখবে না।

কিন্তু পারল কই? ওই মেয়ে যে তাকে চুম্বকের মতো টানে। শয়নে স্বপনে ভাসে ওই মুখ। কী যে ছটফট করেছে তখন তাপস!

শেষে একদিন চলেই গেল। অদৃশ্য বলরেখা তাকে নিয়তি তাড়িতের মতো টেনে নিয়ে গেল হোস্টেলে।

সেদিন তাপসের চোখে চোখ রাখতে পারেনি রাত্রি। ভীরু পাখির মতো কাঁপছিল। প্রায় কান্নার মতো করে প্রশ্ন করেছিল,—কেন এসেছেন? কেন এসেছেন?

তাপস সোজাসুজি বলেছিল,—তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না রাত্রি।

—কিন্তু পর্ণাদি.......? বুম্‌বা.......? এটা কি উচিত?

বুঝি ওই প্রশ্নটাই তাপসকে বলে দিল রাত্রিও দুর্বল হয়েছে তার ওপর। নইলে উচিত-অনুচিতের কথা কেন আসবে রাত্রির মনে?

বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে তাপস বলেছিল,—ভালোবাসা উচিত-অনুচিত মানে না রাত্রি। আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। এর চেয়ে বড় সত্যি এ মুহূর্তে আর কিছু নেই। তুমি আমায় ফিরিয়ে দিয়ো না প্লিজ।

রাত্রির চোখ জলে ভরে গিয়েছিল।

রাত্রি প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি তাপসকে। হয়তো বা চায়ওনি। আর ওই না পারা না চাওয়ার মধ্যিখানে দুলতে দুলতে শুরু হয়েছিল তাদের নতুন জীবন। অবশ্যই গোপনে। কাকপক্ষীকে টের পেতে না দিয়ে। হুটহাট এই বেরিয়ে পড়া। পরস্পরকে ছুঁয়ে অনুভব করা। এতেই বুঝি তাপস এখন বেঁচে থাকার রসদ খুঁজে পাচ্ছে নতুন করে।

ঢালা বিয়ারটা শেষ করল তাপস। আবার ভর্তি করেছে গ্লাস। বাথরুমের দরজা খুলে গেল। সিল্কের শাড়িখানা আলগাভাবে গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে রাত্রি, ড্রেসিংটেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ভালো করে পরছে।

তাপস হাল্‌কা ঠাট্টা ছুঁড়ল,--কষ্ট করে এখন শাড়িটা পরার দরকার কী? এসো, তোমার একটু গন্ধ নিই।

রাত্রি উত্তর দিল না, ভ্রূভঙ্গিও করল না কোনও।

তাপস গ্লাসে চুমুক দিল,—কী হল? এসো।

রাত্রির স্বর ফুটল,—তাড়া কীসের! গোটা দুপুরটা তো পড়ে আছে।

—আহ্, দুপুর আছে বলে কি এই মোমেন্টটা বৃথা যাবে?

জবাব দিল না রাত্রি। কুঁচি ফেলছে শাড়িতে।

তাপস ঈষৎ অসহিষ্ণু হল,—তোমার কেসটা কী বলো তো? আজই বেরোবে বলে মাথা খারাপ করে দিলে, অথচ স্টার্ট করার পর থেকেই অফ মুড। কেন? হলটা কী?

—কিছু না। এমনি। কথা বলতে ভালো লাগছে না।

—কিন্তু কেন? বলেই তাপসের মনে পড়ে গেল এই রবিবারে কৃষ্ণনগর গিয়েছিল রাত্রি। সেখানে কোনও ঝঞ্ঝাট হয়েছে কি? ভুরু জড়ো করে জিজ্ঞেস করল,—তোমার হোমফ্রন্টের খবর সব ভালো তো?

—ওই এক রকম।

—শুভামাসি ঠিক আছেন? দীপু-পিংকিরা?

—তাদের কারুরই তো খারাপ থাকার কথা নয়। তাদের তো শুধু টাকাটা পেলেই হল। বরং আরও বেশি দিলে খুশি হয়।

—তো নাও না আরও কিছু। আমার টাকা তোমার টাকা তো আলাদা নয়।

—তোমার কাছ থেকে তো সব সময়ে নিচ্ছি। আর কত নেব?

—দরকার পড়লে আরও নেবে। তোমাকে দিতে পারলে আমার যে কতটা ভালো লাগে....। বলতে বলতে উঠে এল তাপস। পিছন থেকে বেড় দিয়ে রাত্রির কোমর জড়িয়ে ধরেছে। মিষ্টি একটা গন্ধ বেরোচ্ছে রাত্রির গা দিয়ে। সাবানের গন্ধ। সঙ্গে মিশে আছে রাত্রির শরীরের চেনা সৌরভটাও। তাপসের নেশা ধরে গেল। রাত্রির ভেজা ঘাড়ে মুখ ঘষছে। শব্দ করছে,—উঁ উঁ উঁ....।

রাত্রি মৃদু হাসল। হাত রেখেছে তাপসের মাথায়,—কী হল? খ্যাপামো করছ কেন?

—আমি তো খ্যাপাই। বামাখ্যাপা।

নিজের রসিকতায় নিজেই হাহা করে হাসল তাপস। রাত্রিকে তুলে এনে শুইয়ে দিল বিছানায়। খুলছে রাত্রির সমস্ত আবরণ। সযত্নে পরা শাড়ি এক লহমায় লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। ছিটকে গেল ব্লাউজ সায়া ব্রেসিয়ার। নিজেকেও অনাবৃত করে ফেলেছে ঝটপট। পাগলের মতো রাত্রিকে আদর করছে তাপস। চুমু খাচ্ছে সর্বাঙ্গে। বুক থেকে নাভি, নাভি থেকে জঙ্ঘা সরীসৃপের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে ঠোঁট। শরীরে শরীর মিশে গেল। মৃদু জান্তব শীৎকারে ভরে গেল বিলাসকক্ষ।

মৈথুন শেষ। পঁয়তাল্লিশ বছরের নগ্ন দেহখানা বিছানায় মেলে দিয়ে হাঁপাচ্ছে তাপস। তখনই হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠেছে রাত্রি।

তাপস চমকে পাশ ফিরল,—একি? কাঁদছ কেন?

—আমার আজ খুব ভয় করছে তাপসদা।

—কিসের ভয়?

—পরশু রাত্তিরে একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি। রাত্রি নাক টানল,—পর্ণাদি সব জেনে গেছে। একটা সরু অন্ধকার গলি দিয়ে যাচ্ছি আমি, হঠাৎ পর্ণাদি এসে চেপে ধরল আমায়। আঙুল তুলে শাসাচ্ছিল, তুই আমার সর্বনাশ করেছিস রাক্ষুসি, তোকে আমি দেখে নেব।

—দূর পাগলি, আবার সেই উল্টোপাল্টা ভাবনা? কত বার না বলেছি পর্ণার জানার কোনও চান্স নেই। তাপস আলতো করে হাত বোলাল রাত্রির মসৃণ পেটে,—আর জানলেই বা কী? আমার কাছে পর্ণা আর আগে নয়, তুমি আগে। পর্ণাকেও তো আমি বঞ্চিত করি না, সে তো তার প্রাপ্যটুকুন পাচ্ছে।

রাত্রি যেন শুনেও শুনল না কথাগুলো। আপন মনে বলল,—পর্ণাদির পেছনেই

তুমি দাঁড়িয়েছিলে তাপসদা। তুমি কিচ্ছু বলছিলে না পর্ণাদিকে।

—মাই গড! তাই তোমার এত মনখারাপ? তাপস আবার জড়িয়ে ধরল রাত্রিকে। স্তনবৃন্তে চুমু খেল,—এখনও তোমার বিশ্বাস হয় না আমি তোমায় ভালোবাসি?

—সত্যি ভালোবাসো?

—সন্দেহ আছে এখনও? বলো কী প্রমাণ দিতে হবে?

—থাক।

—বিশ্বাস করো, তোমায় আমি এক মুহূর্ত ভুলতে পারি না। যখনই চোখ বুজি, তোমায় দেখতে পাই।

—হুঁহ্। আমি মরে গেলে তিন দিনও আমায় মনে রাখবে তো?

কথাটা যেন ঝাং করে বাধল তাপসের কানে। আর্তস্বরে বলল,—তুমি......তুমি....তুমি এ কথা বলতে পারলে?

রাত্রি চুপ করে শুয়ে রইল একটুক্ষণ। চোখ দুটো ঘুরছে কড়িকাঠে। হঠাৎই বলে উঠল,—তুমি কি রাগ করলে তাপসদা?

তাপস উদাসীন স্বরে বলল,—নাহ্।

—চলো না বড় করে কোথাও একটা ঘুরে আসি। অন্তত দিন তিনেকের জন্য।

—যাওয়াই যায়। কোথায় যাবে?

—চাঁদিপুর চলো আবার। দোলের সময়ে টানা কদিন তো ছুটি আছে। জ্যোৎস্নায় সমুদ্রের ধারে ঘুরব, হাঁটতে হাঁটতে চলে যাব সেই বুড়িবালামের মোহনায়, সেই লাল লাল কাঁকড়াগুলো দেখা দেবে, মিলিয়ে যাবে.....। সারা দিন খুব স্নান করব সমুদ্রে। কী খোলা আকাশ, কত বাতাস.....। হোটেলের এই বন্ধ ঘর আর ভালো লাগে না তাপসদা। যাবে?

তাপস মনে মনে অন্য হিসেব কষছিল। দোলের সময়ে অফিসট্যুর কি দেখানো যাবে? টানা চার-পাঁচ দিন? এছাড়া আর কী মিথ্যে বলা যায় পর্ণাকে? আর কী.......?

দুই

পর্ণা বলল,—মিথ্যে বোলো না। কাল তুমি বড়দার বাড়ি যাওনি।

—না মানে.....। তাপস আমতা আমতা করল,—অফিসে কাল সুমোহন এসেছিল, প্রায় জোর করে তুলে নিয়ে গেল পুরনো আড্ডায়....

—বাহ্ বাহ্, চমৎকার! গোটা সন্ধেটা আড্ডা মেরে কাটালে আর ফিরে এসে গুল ঝেড়ে দিলে, বউদি বাপের বাড়ি গেছে, রাত দশটার আগে ফিরবে না!

—ও কে, ও কে। কাল যাব।

—কাল কেন? হোয়াই নট আজ? আজও তো ঘুরে আসতে পারতে।

রাত্রির সঙ্গে মনোরম একটা দিন কাটিয়ে সদ্য সদ্য ডায়মন্ডহারবার থেকে ফিরেছে তাপস, পর্ণার কর্কশ জেরায় আমেজটা কেটে যাচ্ছিল। সামান্য বিরক্ত মুখে বলল,—তোমার গড়িয়ে রাখা গয়না আনা নিয়ে তো কথা। এক-দু'দিন আগে পরে হলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হবে?

—তুমি ভবানীপুরের ওপর দিয়ে আসো বলেই বলা। সঙ্গে তোমার গাড়িটাও থাকে।

—মাথায় এক লাখ চিন্তাও থাকে। সব কিছু অত খেয়াল রাখা সম্ভব নয়।

—চেঁচিয়ো না। বুম্বা ও ঘরে পড়ছে।

তাপস দাঁতে দাঁত চাপল,—তুমিও তো গিয়ে নিয়ে আসতে পারো। টালিগঞ্জ থেকে ভবানীপুর কী এমন দূর!

—উপায় থাকলে যেতাম বৈকি। পর্ণার চাপা গলায় ধমকের সুর,—ছেলের কবে থেকে পরীক্ষা খেয়াল আছে? কোনও খোঁজখবরই তো রাখো না। ভাবো কটা টাকা দিয়ে মাথা কিনে নিলে। এ সময়ে আমি ড্যাং ড্যাং করে বড়দার বাড়ি ছুটলে বুম্বার কী হবে, অ্যাঁ?

—কী হবে?

—সে বোধ তোমার থাকলে তো।

পর্ণা দু-এক ঘণ্টা বাড়িতে গরহাজির থাকলে বুম্বার কী এমন গভীর সর্বনাশ হবে মাথায় ঢুকল না তাপসের। পড়বে কে? বুম্বা? না পর্ণা? সারাক্ষণ ছেলের ঘাড়ের ওপর ফোঁস ফোঁস করে কী যে সুখ পায়! তবে এ কথা বলার জো নেই। পর্ণার কাছে বুম্বা-ইস্যু দারুণ সেন্সেটিভ। কোন কথা কখন আঁতে লেগে যাবে

ওমনি মুখ হাঁড়ি, তিন দিন বাক্যালাপ করবে না। তখন আবার মানভঞ্জন করতে হবে তাপসকেই। ভাল্লাগে না।

তাপস ঘরে ঢুকে গেল। প্যান্টশার্ট বদলাচ্ছে। শার্টের বোতাম খুলতে গিয়ে মৃদু হোঁচট। কাঁধে একটা লম্বা চুল। ফেরার পথে অনেকক্ষণ কাঁধে মাথা রেখেছিল রাত্রি, তখনই কী? ভাগ্যিস পর্ণার নজরে আসেনি। অবশ্য এলেও আমল দিত কিনা সন্দেহ। আজকাল তাপসের কোন ব্যাপারেই বা আর পর্ণার আগ্রহ আছে! তার পৃথিবী তো এখন বুম্‌বাময়।

ড্রয়িং-ডাইনিং হলের দেওয়ালঘড়ি ঘণ্টা পেটাচ্ছে। দশটা বাজল। টেবিলে খাবার সাজিয়ে ডাকাডাকি করছে পর্ণা। আসার সময়ে আমতলায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে চা তেলেভাজা খাওয়া হয়েছিল, এখনও পেটটা ভুসভুস করছে, গলাতেও জ্বালা-জ্বালা ভাব. তবু খাব না বলার সাহস হল না তাপসের। খিটিরমিটির বাধবে। পায়ে পায়ে এসে বসল টেবিলে।

পাঞ্জাবির হাতা গোটাতে গোটাতে জিজ্ঞেস করল,—বুম্‌বা খেয়েছে?

—বুম্‌বা কি এত রাত অব্দি না খেয়ে বসে থাকবে?

—সোজা কথার সোজা উত্তর দাও না কেন? হ্যাঁ না বললেই তো চুকে যায়।

—তুমিই বা এমন অবভিয়াস প্রশ্ন করো কেন?

অন্যদিন এই চাপান-উতোরে হেসে ফেলে তাপস। আজ গোমড়া হয়ে গেল। নিঃশব্দে রুটি ছিঁড়ছে, ডোবাচ্ছে মুরগির ঝোলে। মনকে প্রসন্ন করার জন্য রাত্রিকে মনে করার চেষ্টা করল। দুপুরের দিকে অনেকটা ঝলমলে হয়ে উঠেছিল রাত্রি, গুনগুন গান গাইছিল আপন মনে। হঠাৎ হঠাৎ অবশ্য উদাসও হয়ে যাচ্ছিল একটু, ব্যালকনিতে গিয়ে চোখ মেলে দিচ্ছিল নদীর দিকে। ওই দূরমনস্ক রাত্রিকে যে কী অপরূপা লাগে। মনে হয় যেন এই গ্রহের মানবী নয়, যেন কোনও অচিন তারা থেকে ছিটকে এসে ডুবে আছে স্মৃতিতে, এই পৃথিবীটাকে সে দেখছেই না। কী যে অত ভাবে ওই মেয়ে? ইশ্, তাপস যদি তার মনটা পুরোপুরি পড়তে পারত!

খেয়ে উঠে তাপস একটা সিগারেট ধরাল। চালিয়েছে টিভিটা। বুম্‌বার ঘরের আলো নিবে গেছে, শুয়ে পড়েছে বুম্‌বা, এই সময়ে একটু জোরে টিভি চালালেও রেগে যাবে পর্ণা। খবরটা দেখছিল তাপস, মন দিয়ে। ডায়মন্ডহারবার রোডে ভোরবেলা একটা লরি তিনটে লোককে চাপা দিয়েছে, লরি ড্রাইভার খালাসি সবসুদ্ধ বেপাত্তা। কোন জায়গাটায় হয়েছে? ওই রাস্তা দিয়েই তাপস এল গেল, কিছু বুঝতে পারল না তো? পুরুলিয়ার এক গ্রামে অজানা অসুখের প্রকোপে মারা গেছে আটজন। নতুন ধরনের কোনও ম্যালেরিয়া-ট্যালেরিয়া? শীত কমার পর বেশ মশা

বেড়েছে, এ সময়ে সাবধানে থাকা দরকার। জানলাগুলোয় নেট লাগিয়ে নিলে কেমন হয়? বর্ধমানে কোল্ড স্টোরেজের দাবিতে চাষিদের বিক্ষোভ। ওফ্, এই বিক্ষোভ মিছিল দেখে দেখে চোখ পচে গেল। নিজের ভাবনা নিজে ভাব না তোরা, সরকারের ভরসায় থাকিস কেন? ধুস, এ সব খবর কাঁহাতক দেখা যায়! তাপস চ্যানেল ঘুরিয়ে দিল। কোথাও তেমন জুৎসই কিছু হচ্ছে না। তাও মিনিট খানেক চোখ আটকে রাখল এক বিদেশি চ্যানেলে। স্বল্পবাস মেয়েরা বেড়ালপায়ে হাঁটছে, এক-আধটা মেয়ের ঊর্ধ্বাঙ্গ একেবারেই অনাবৃত। তবে শরীরগুলো তেমন টানছে না, ভারী হয়ে আসছে চোখের পাতা।

এতক্ষণে যেন ক্লান্তিটা টের পাচ্ছিল তাপস। সম্ভবত অতটা লম্বা গাড়ি চালানোর ধকল। একটা পঁচিশ বছরের মেয়ের সঙ্গে দিনভর শরীরের খেলায় মেতে থাকার পরিশ্রমও কম নয়। সব কিছু মিলে মিশে স্নায়ু যেন অবশ ক্রমশ। বয়স তো হচ্ছে, কত আর সয়!

টিভি অফ করে তাপস সোজা বিছানায় চলে এল। পর্ণা ড্রেসিংটেবিলের সামনে, মুখে ক্রিম ঘষছে। পরনে রাতপোশাক। হঠাৎ বলল,—এই জানো, একটা ভালো ছেলে পেয়েছি।

—ছেলে? তাপসের আদৌ বোধগম্য হল না,—পেয়েছ মানে?

—আরে, ছেলে মানে পাত্র। আমাদের রাত্রির জন্য।

টাং করে ইলেক্ট্রিক শক খেল যেন তাপস। পরক্ষণে সামলে নিয়ে বলল,—তুমি কি আজকাল ঘটকালি শুরু করেছ নাকি?

—রাত্রির জন্য ছেলে দেখাটা মোটেই ঘটকালি নয়। এটা আমাদের দায়িত্ব।

তাপস সতর্কভাবে বলল,—রাত্রি জানে?

—কী?

—এই যে ছেলে দেখছ?

—ওর জানাজানির কী আছে! আজ না হোক কাল তো বিয়ে করতেই হবে। কদ্দিন আর আইবুড়ো হয়ে বসে থাকবে?

তাপস আরও সাবধানী হয়ে গলায় পলকা গাম্ভীর্য ফোটাল,—দুম করে ওর বিয়ে হয়ে গেলে তোমার শুভামাসিদের কী হবে? সংসারে ওই তো একমাত্র আর্নিং মেম্বার। দীপুর তো এখনও গ্র্যাজুয়েশন হলো না!

—দীপু কবে পাশ করবে, চাকরি পাবে......তার জন্য রাত্রিও বসে থাকবে নাকি? ওর একটা জীবন নেই? সাধ-আহ্লাদ নেই?

—কিন্তু তোমার শুভামাসি কি এখন মেয়ের বিয়ে দিতে চাইবেন?

—চাইবে। আমার সঙ্গে শুভামাসির কথা হয়েছে। শুভামাসিও বলছে ......।

পর্ণা উঠে বিছানায় এল। গায়ে চাদর টানতে টানতে বলল,—তাছাড়া বিয়ের পরও তো রাত্রি মাকে সাহায্য করতে পারে। পারে না?

—হুম।.........তা কী করে ছেলে?

—গভর্নমেন্টে আছে। আপার ডিভিশান ক্লার্ক। রাইটার্সে বসে। রঞ্জুদার ছোট শালা। রঞ্জুদা আর টুসিবউদি রাত্রিকে দেখেছিল। বুম্‌বার জন্মদিনে। টুসিবউদির নাকি তখনই খুব পছন্দ হয়েছিল। আজ দুপুরে ফোন করে নিজেই প্রোপোজালটা দিল। ওরাও একটা মোটামুটি ঘরোয়া সুশ্রী অথচ চাকরি-বাকরি করে এমন মেয়ে খুঁজছে।

—তারা বউ-এর চাকরির টাকা বাপের বাড়িতে দিতে দেবে?

—দেবে গো দেবে। সে কথাও হয়েছে। ওরা শুভামাসিদের অবস্থা সব জানে। কিচ্ছু দিতে থুতেও হবে না। এমন সম্বন্ধ কি ফেলে দেওয়া উচিত, বলো?

সূক্ষ্ম প্রতিরোধটা ভেঙে পড়ায় বেশ অসহায় বোধ করল তাপস। মনে মনে বলল, শুধু রাত্রির মাইনের টাকায় তোমার শুভামাসির থোড়াই চলবে! আমি পাশে আছি বলেই না তারা ঠিকঠাক টিকে আছে।

বুকের ধুকপুকুনিটা লুকিয়ে রেখে তাপস নিরাসক্ত হওয়ার ভান করল। বলল,—ভালো তো। লাগিয়ে দাও। তবে আমার মনে হয় একবার রাত্রির সঙ্গেও কথা বলে নেওয়া দরকার। শোরুমে ছেলেদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একসঙ্গে কাজ করছে, তাদের মধ্যে ওর কাউকে মনে ধরেছে কিনা, কোনও অ্যাফেয়ার-ট্যাফেয়ার হয়েছে কিনা.....। তাছাড়া তুমি বললেই তো হবে না, ওরও তো একটা মতামত আছে। আর সেটাকেও তো আমাদের মূল্য দেওয়া উচিত।

—সেই জন্যই তো ওকে আজ শোরুমে ফোন করেছিলাম। ভাবলাম ডাকি। সরাসরি কথা বলি। সে তো আজ কাজেই যায়নি। হাত বাড়িয়ে পর্ণা বেডসুইচ অফ করে দিল।

তাপস কাঁটা হয়ে গেলে। রাত্রির হোস্টেলেও কি ফোন করেছিল পর্ণা? যদি শোনে রোজকার মতোই সকালে সেজেগুজে বেরিয়ে গেছে রাত্রি.....! তুৎ, তাহলে তো পর্ণা আগেই বলত।

নিশ্বাস চেপে তাপস বলল,—একবার হোস্টেলে ফোন করে দেখতে পারতে।

—অনেক বার করেছি। লাইন পেলাম না। পর্ণা পাশ ফিরল,—তুমি কাল একবার খোঁজ নিয়ে আসবে?

—আমি কখন যাব?

—যাও না। ও তো কামাই করার মেয়ে নয়। শরীর-টরীর খারাপ হল, নাকি কৃষ্ণনগর থেকেই ফেরেনি.......কাল একবার ঘুরে এসো।

—কত জায়গায় যাব কাল? এন্টালি ভবানীপুর..........!

—জাস্ট একটু খবর নেওয়া। পারবে না? মেয়েটা আমাদের ওপর কত ডিপেন্ড করে......

—দেখি। যদি সময় করতে পারি........

কথাগুলো বলে চোখ বুজে ফেলল তাপস। খারাপ লাগছে। কোথায় যেন বিঁধছে। পর্ণা বড্ড বেশি বিশ্বাস করে তাকে। কিন্তু সে যে আচরণটা করে চলেছে তাকে কি প্রতারণা বলে না?

তা কেন হবে! পর্ণাই তো তার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। চব্বিশ ঘণ্টা সংসার আর বুম্‌বা, বুম্‌বা আর সংসার, পর্ণার জীবনে তাপস এখন কোথায়! ফাঁকটা তৈরি হয়েছে বলেই না তাপসের মন অন্য দিকে ঘুরেছে। তাপসের সঙ্গ পাওয়ার জন্য এতটুকু হাহাকার আছে পর্ণার মধ্যে? তাদের সম্পর্কটা তো এখন নেহাতই কেজো, এর মধ্যে প্রতারণার প্রশ্ন আসে কোথ্‌থেকে? তাছাড়া পর্ণাকে তো সে কণামাত্র অবহেলা করছে না। নিজের জায়গায় শক্ত খুঁটি গেড়ে পর্ণা যেমন ছিল তেমনই তো আছে।

পর্ণার উল্টো দিকে পাশ ফিরল তাপস। বুকের ধুকপুকুনি ফিরে আসছে আবার। অন্যভাবে। পর্ণাটা কি শুরু করল? সত্যি সত্যি রাত্রির বিয়ে হয়ে যাবে নাকি? তাপস তবে কী নিয়ে থাকবে? কাকে নিয়ে থাকবে? একদিন যে রাত্রিকে বলেছিল, তোমায় ছাড়া আমি বাঁচব না, তখন ছিল কথাটা একটা মরিয়া আবেগ। এখন তাপস মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে রাত্রি ছাড়া বেঁচে থাকাটা তার সত্যিই নিরর্থক। তার এই মধ্যবয়সে রাত্রি যেন এক ঝলক টাটকা বাতাস। ওই অক্সিজেনটুকু চলে গেলে তাপস নিশ্বাস নেবে কী করে!

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। বেডসুইচ টিপে আলো জ্বালল তাপস। নামল খাট থেকে। টুলে রাখা জগ নিয়ে ঢকঢক জল খেল খানিকটা। হাল্‌কা চাপ অনুভব করল তলপেটে, বাথরুম ঘুরে এল। সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় না গিয়ে দাঁড়িয়েছে খাটের পাশে। পর্ণাকে দেখছে।

একটু আগেও পাশ ফিরে ছিল, এখন পর্ণা চিত হয়ে শুয়ে। ইদানীং বেশ চর্বি জমেছে পর্ণার শরীরে, পেটের কাছটা বেঢপ লাগে। ছড়ানো হাতদুটোও কী রকম যেন মোটা মোটা। ক'বছর আগেও ফিগারটা বেশ ছিল, এখন যেন তাকানোই যায় না। হুঁহ্‌, শরীরটাকে টনকো রাখবে, না বুম্‌বার ঘাড়ে চেপে থাকবে সারাক্ষণ!

পর্ণা নড়েচড়ে উঠল একটু। চোখ খুলেছে পুট করে। জড়ানো গলায় বলল,—আহ্‌, আলোটা জ্বাললে কেন?

—জল খাচ্ছিলাম।

—হয়েছে তো খাওয়া। এবার নেবাও। চোখে আলো পড়লে ঘুমোন যায়!

তিলমাত্র রোমান্টিকতা নেই পর্ণার। মাধুর্য উবে গেছে, কমনীয়তাও। এখন তাপস যেন তার কাছে নিছক একটা পাশবালিশ। মাঝে মাঝে অভ্যাস বশে জড়িয়ে শোয়, ভালো না লাগলে ঠেলে সরিয়ে দেয়। কিংবা নিয়ম মাফিক ফেলে রাখে বিছানায়। এমন বউকে তাপসও নিষ্প্রাণ জড়বস্তু ছাড়া আর কীই বা ভাববে!

ঘর অন্ধকার করে তাপস আবার বিছানায়। আবার রাত্রিকে মনে পড়ল। কী অপরূপ মমতায় নরম হাতে তার চুলে বিলি কাটছিল রাত্রি। কী নিবিড় চোখে দেখছিল তাপসকে। ওই মেয়ে অন্য কাউকে বিয়ে করবে? অসম্ভব।

রাত্রি কক্ষণো তাপসকে ছেড়ে যাবে না। যেতে পারবেই না।

তিন

কে যে কখন কাকে ছেড়ে যায় কেউ কি তা নিশ্চিতভাবে বলতে পারে? মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আস্থাটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে, তাপস কি তা কল্পনাও করতে পেরেছিল?

পরদিন অফিসে বেশ খোশমেজাজেই ছিল তাপস। দুপুর বারোটা নাগাদ কেজরিওয়ালের ফাইলটা সই হয়ে বেরিয়ে এল এম-ডির ঘর থেকে, সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে হিসেবটাও করে ফেলল তাপস। সত্তর লাখের হাফ পারসেন্ট। মানে পঁয়ত্রিশ হাজার। চেপেচুপে আর একটু বাড়ানো যায়, প্রয়োজনটা কী, সোনার ডিম পাড়া হাঁসকে বেশি যাতনা দিতে নেই। কেজরিওয়াল এই কাজটা নিয়ে ঢুকছে, পরে আবার মওকা বুঝে দাঁও মারা যাবে।

কেজরিওয়ালের ফোন আসার তর সইছিল না তাপসের। নিজেই ধরল কেজরিওয়ালকে।

খবরটা শুনে কেজরিওয়াল উল্লসিত,—থ্যাংক ইউ স্যার। আই অ্যাম গ্রেটফুল টু ইউ স্যার।

—শুধু শুকনো থ্যাংকস দিয়েই গুড নিউজটা সেলিব্রেট করবেন?

—ছি ছি, এ কী বলছেন? আসুন, আজই একটা কিছু হয়ে যাক। ছোট করে।

—আজ? মুহূর্তের জন্য একটু ভেবে নিল তাপস,—আজ লাস্ট আওয়ারে অফিসে আসুন। হাতে হাতে অর্ডারটাও নিয়ে নেবেন, তারপর নয় কোথায় একটা গিয়ে........

—আজ তাজবেংগলে ডিনার। আমি শার্প সাড়ে পাঁচটায় আসছি। ফাইনাল?

—ফাইনাল।

ফোন রেখে তাপস মনে মনে গান ভাঁজল। ভোগ করো কানায় কানায়, ভোগ করো কানায়.....। দিস ইজ হাই টাইম, এখনই যা গোছানোর গুছিয়ে নিতে হবে। বেসরকারি কোম্পানি, হাল এখনও ভালো, কিন্তু কাল কী হবে তার ঠিক কী! কত বড় বড় ইস্পাত কারখানার নাভিশ্বাস উঠেছে, তাদের এই মিনি স্টিল প্ল্যান্ট দুম করে শুয়ে পড়তে কতক্ষণ! এই পঁয়ত্রিশ হাজার টাকাটা অবশ্য ওড়ানো পোড়ানো চলবে না। এদিক-ওদিক করে রাখতে হবে সযত্নে। বুম্‌বার ফিউচারের ভাবনা আছে না! এখানে নয়, ব্যাংগালোরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াবে বুম্‌বাকে। অনেক

টাকা লাগবে, এখন থেকে সঞ্চয় না করলে চলবে কেন! তাপসের নিজের খুব ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সাধ ছিল, দু-দু-বার জয়েন্টে বসেও চান্স পায়নি। বুম্‌বা নিশ্চয়ই পারবে। তার জন্য দরকার হলে ইলেভেন থেকে বুম্‌বার পিছনে চারখানা টিউটর লেলিয়ে দেবে তাপস। যদি কম্পিউটারটা পেয়ে যায়, ওফ্ নাথিং লাইক ইট। কোথায় যে উঠে যাবে বুম্‌বা!

স্বপ্নটাকে একটুক্ষণ নাড়াচাড়া করে তাপস কাজে ডুবে গেল দ্রুত। বড়বাবুকে ডেকে রেডি করতে বলল অর্ডারটাকে। একদিন ডুব মারাতে বেশ কিছু কাজ জমেছে টেবিলে, মন দিয়ে দেখছে ফাইলগুলোকে। কম্পিউটারে ফিড করছে ডাটা, তথ্য বের করছে, মেলাচ্ছে ফাইলের সঙ্গে। কাজের সময়ে তাপস একদম অন্য মানুষ, বিশ্বসংসারের কোনও কথাই তখন তার মাথায় থাকে না। এই গুণটার জন্যই তো একেবারে নীচের তলার অফিসার হয়ে ঢুকে সে পারচেজ ডিপার্টমেন্টের দু-নম্বর।

দুটো নাগাদ একটু বুঝি হাঁফ জিরোবার অবকাশ পেল। উঠে লান্‌চে গেল, অফিসার্স ক্যান্টিনে। দুপুরবেলা অফিসে হাল্‌কা খাবারই খায় তাপস। স্যান্ডুইচ বা স্যুপ-টুপ গোছের কিছু। এসব খানা সে যে খুব পছন্দ করে তা নয়, তবে কাজের সময়ে হাল্‌কা খাদ্যেই সে স্বচ্ছন্দ বোধ করে।

লান্‌চ টেবিলে মার্কেটিং-এর অনুপ দত্তর মুখোমুখি। বছর পঞ্চাশের অনুপও স্যান্ডুইচ চিবোচ্ছে। খাওয়া থামিয়ে বলল,—শুনেছেন তো, আবার একটা ভি আর স্কিম আসছে?

তাপস আলগাভাবে ঝাঁকাল,—এখনও তো তেমন কিছু ফাইনালাইজ হয়নি।

—মার্কেটিং-এও কি লোক কমাবে?

—মনে হয় না। অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের স্টাফ-টাফই একটু ঝরাতে চাইছে।

—ইউনিয়ান ঝামেলা পাকাবে না?

—তুৎ, ইউনিয়ানের আর জোশ আছে নাকি! গলাটা একটু নামাল তাপস,—ট্রেড ইউনিয়ানবাজির কোমর ভেঙে গেছে, বুঝলেন।

—সত্যি, লিডারগুলো এখন কেমন মিনমিন করে।

—হুম।

অনুপ দত্তর সঙ্গে গল্প করতে করতে সময় গড়িয়ে গেল খানিকটা। প্রায় পৌনে তিনটে নাগাদ তাপস বেরোল ক্যান্টিন থেকে। হন হন করে হাঁটছে, তখনই রিসেপশান কাউন্টার থেকে তন্বী মহিলাকর্মীটি ডাকল,—স্যার.....? স্যার..........?

তাপস ঘুরে দাঁড়াল,—ইয়েস?

—আপনার বাড়ি থেকে দু-বার ফোন এসেছিল।

—এনি মেসেজ?

—না স্যার। তবে আপনি ফিরলেই মিসেস মিত্র আপনাকে ধরে দিতে বলেছেন।

ঊর্মিলা সেন এমন ভঙ্গিতে ধরে দেওয়ার কথাটা উচ্চারণ করল যেন তাপস কোনও ফেরারি আসামী! কিম্বা খাঁচার চিড়িয়া, পালিয়েছে ফুড়ুৎ করে!

তাপস হেসে ফেলল। টেলিফোন অপারেটার কাম রিসেপশনিস্ট মেয়েটার সঙ্গে একটু রঙ্গরসিকতা করার লোভ সামলাতে পারল না,—ওয়ারেন্টটা কী রকম ছিল ম্যাডাম? বেলেবল্? না ননবেলেবল্?

ঊর্মিলাও চমৎকার এক টুকরো হাসি উপহার দিল ডেপুটি পারচেজ ম্যানেজারকে,—বুঝতে পারলাম না স্যার। তবে মনে হলো কলটা খুব আরজেন্ট।

পর্ণার জরুরি মানে তো নির্ঘাৎ কিছু নতুন বায়নাক্কা। তবে আজ তাপসকে দিয়ে কিচ্ছুটি করানো যাবে না। আজ সন্ধেবেলা তাজবেংগল ফিট হয়েছে, আজ হেল উইথ এভরিথিং। কদ্দিন যে পরের পয়সায় জমিয়ে মাল খাওয়া হয় না!

তাপস আর একটু ঝুঁকল,—মিসেসদের আরজেন্সির মানে বোঝেন? হয় এটা কিনে আনো, নয় ওখানে ছোট......

—কিন্তু স্যার, ম্যাডামের ভয়েসটা খুব টেন্স লাগছিল।

হাল্কা ছন্দটা কেটে গেল। কোনও বিপদ- আপদ ঘটল নাকি? বুম্বার কিছু হয়নি তো? বিষ্ণুপুর থেকে মা-বাবার কোনও খারাপ খবর এল কি? বাবার হার্টের প্রবলেম বেশ বেড়েছে ইদানীং। নিঃশ্বাসের কষ্ট, প্লাস টলে টলে যাওয়া....দাদা গত সপ্তাহেও ফোনে বলছিল এখানে কোনও বড় স্পেশালিস্টের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে, ডেট ঠিক হলে বাবাকে নিয়ে আসবে, রোজই ভুলে ভুলে যাচ্ছে তাপস। মারাত্মক কিছু ঘটে গেল? নাকি মার সেই পুরনো পেটের ব্যথাটা আবার চাগাড় দিয়েছে?

হতে পারে অনেক কিছুই। আবার হয়তো কিছুই না। পর্ণা তো সামান্য ব্যাপারেই একটু বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এমনকি কাজের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করেও পর্ণা টেন্স। অহেতুক উদ্বিগ্ন হওয়াটা বুঝি মেয়েদের চারিত্রিক ধর্ম।

বাড়ির লাইনটা ধরে দিতে বলে নিজের চেম্বারে ফিরল তাপস। মৃদু এসি চলছে, দিব্যি একটা নরম আমেজ বিছিয়ে আছে ঘরে। ঘুরনচেয়ারে হেলান দিয়ে তাপস একটা সিগারেট ধরাল। সবে তৃতীয় টানটা দিচ্ছে, দূরভাষের পিপ্ পিপ্।

রিসিভার তুলতেই পর্ণার স্বর আছড়ে পড়েছে,—এই শুনছ? সর্বনাশ হয়ে গেছে।

সর্বনাশ! তাপস পলকে টান টান। যে কোনও কথাই স্বরের ব্যঞ্জনায় নিজস্ব

গুরুত্ব বুঝিয়ে দেয়। পর্ণার এখনকার সর্বনাশ মোটেই বুম্‌বার ক্লাসটেস্টে কম নম্বর পাওয়ার সর্বনাশ নয়। তার চেয়ে বড় কিছু।

তাপস কানে রিসিভারটা চেপে ধরল, —কী হয়েছে?

—ভীষণ বিপদ। রাত্রি সুইসাইড করতে গিয়েছিল। অ্যাসিড খেয়েছে। হোস্টেলের বাথরুম ভেঙে বার করতে হয়েছে ওকে।

তাপস লক্ষ ভোল্টের শক্‌ খেল। কয়েক মুহূর্ত নির্বাক। এমন একটা ভয়ংকর সংবাদ তাকে শুনতে হলো! ভুল শুনছে না তো?

পর্ণা বলে চলেছে,—বোধহয় বাঁচবে না। সাংঘাতিক সিরিয়াস কন্ডিশান। .....হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ তুমি? হ্যালো......? হ্যালো.........?

তাপসের হৃৎস্পন্দন কয়েক সেকেণ্ডের জন্য বুঝি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সম্বিতে ফিরতে সময় লাগল আরও কয়েক সেকেণ্ড। বহু কষ্টে একটাই স্বর ফোটাতে পারল গলায়। আজব এক প্রশ্ন বেরিয়ে এল মুখ থেকে,—কেন?

—কী করে বলব কেন! এই তো খানিক আগে ওর হোস্টেল থেকে ফোন এসেছিল। আমিও সেই থেকে তোমাকে ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

তাপস চোখ বুজে ফেলল। রাত্রির মুখখানা মনে পড়ল কী? কাল বিকেলের সেই উদাসীন বসে থাকা? সেই ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠা?

—ওরা........মানে হোস্টেলা থেকে ওকে ন্যাশনাল মেডিকেলে নিয়ে গেছে। বুম্‌বা তো স্কুলে, চারটের আগে ফিরবে না। আমি পাশের ফ্ল্যাটে চাবি রেখে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ছি। তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসো। যত তাড়াতাড়ি পারো।

লাইনটা কেটে যাওয়ার পরও তাপস রিসিভার চেপে রইল কানে। যেন আরও কিছু কথা শোনার আছে। যেন আরও অনেক কথা বাকি রয়ে গেল। অথবা এতক্ষণ ধরে যা শুনেছে তা সত্যি নয়, ভুল খবর দিয়ে তাকে পরীক্ষা করতে চাইছে পর্ণা।

কিন্তু রাত্রি হঠাৎ এমন কাজ করে বসবে কেন? কাল তো সামান্যতম আভাস দেয়নি? নিজেই না চাঁদিপুরে বেড়াতে যাওয়ার কথা তুলল? পরে সেই বেড়াতে যাওয়া নিয়ে কত প্ল্যান হলো, ঠাট্টা-ইয়ার্কি করছিল তাপস, মিটিমিটি হাসছিল রাত্রি........!

সেই রাত্রি আজ অ্যাসিড খেয়েছে?

ঊর্মিলা পি-বি-এক্স বক্স থেকে খুট খুট আওয়াজ বাজাচ্ছে,—কিছু বলছেন স্যার?

তাপস চমকে উঠে রিসিভার নামিয়ে রাখল। আঙুলের সিগারেট পুড়ে পুড়ে লম্বা একটা ছাই তৈরি করেছে, অ্যাশট্রেতে চেপে চেপে আগুনটাকে নেবাল, হাত

বাড়িয়ে টেবিলে রাখা গ্লাসটাকে খামচে ধরল সজোরে। এক চুমুকে খেয়ে নিল পুরো জল।

হঠাৎ আঘাতে অসাড় হয়ে যাওয়া স্নায়ুরা স্বাভাবিক হচ্ছে ধীরে ধীরে। প্রাথমিক অভিঘাত কেটে যাওয়ার পর মন চেতনায় ফিরছে ক্রমশ। আবেগকে সরিয়ে দিয়ে আপনা আপনি অন হয়ে গেল মস্তিষ্কের কমপিউটার। এবার? এর পর? কী কী ঘটতে পারে এখন? হয় রাত্রি বাঁচবে, নয় মারা যাবে। এর মাঝামাঝি তো কিছু নেই। পর্ণার কথা শুনে যা মনে হলো মৃত্যুর সম্ভাবনাই বেশি। কী অ্যাসিড খেয়েছে? বাথরুম পরিষ্কার করার? মিউরেটিক? ওই অ্যাসিড খেলে চান্স জিরো পারসেন্ট। যদি মারাই যায়, তো তাপসের পজিশানটা কী হবে? সে কি ধরা পড়ে যাবে? তাপসের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা বরফের স্রোত নেমে গেল। রাত্রি কি সুইসাইড নোট রেখে গেছে কোনও? আত্মহত্যার কেস যখন, পুলিশ এনকোয়্যারি হবে। হবেই। হয়তো এতক্ষণ প্রসেস স্টার্টও করে গেছে। কী থাকতে পারে সুইসাইড নোটে? আমার মৃত্যুর জন্য আমার জামাইবাবু তাপস মিত্র দায়ী, এরকম কোনও........? কিংবা আমি তাপসদার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলাম, তাকে মুক্তি দিয়ে গেলাম, এমন কিছু.......?

যাহ্, রাত্রি তা করতেই পারে না। তাপসকে ফাঁসিয়ে দিয়ে যাবে রাত্রি? অসম্ভব। তাপসের জন্য অন্ধ ভালোবাসা আছে রাত্রির, সে কখনও ক্ষতি করতে পারে তাপসের? হতেই পারে না।

তাপস আর একটা সিগারেট ধরাল। রাত্রি কি এখনও বেঁচে আছে? জ্ঞান আছে, রাত্রির? কথা বলতে পারছে? মৃত্যুর আগে মানুষ নাকি সত্যকে গোপন রাখতে পারে না, স্বাভাবিক সারভাইভাল ইন্সটিংক্টই তাকে দিয়ে বলিয়ে নেয় সত্যিটাকে। ডাইয়িং ডিক্লারেশান! পুলিশের কাছে না হোক, আর কাউকে যদি বলে দেয় সব?

সবাই জেনে যাবে। সবাই জেনে যাবে।

তাপসের আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট টিপটিপ কেঁপে উঠল। চেষ্টা করেও থামাতে পারছে না কাঁপনটাকে। এয়ার কন্ডিশনড ঘরে বসেও ঘামছে দরদর। তেমন হলে তাপসকে তো অ্যারেস্ট করতে পারে পুলিশ। তারপর? তাপস মুখ দেখাবে কী করে? আত্মীয়স্বজন বলবে, কী হে তাপস, তোমাকে আমরা তো ভালো বলে জানতাম। সেই তুমি একটা বাপমরা অসহায় মেয়ের অভাবের সুযোগ নিয়ে......ছি ছি ছি, তুমি এই? বন্ধুরা টিটকিরি ছুঁড়বে, আসলের সঙ্গে সুদও জুটিয়েছিলি মাইরি! দেড়েমুশে খুব এনজয় করেছিস? হজম করতে পারলি না তো শেষ পর্যন্ত? অফিস কলিগরা হাসাহাসি করবে, মিত্তিরটা কী যন্তর, মাল্লু থেকে

মেয়েছেলে সব চেটে চেটে বেড়াচ্ছে! খা ব্যাটা এখন, হাজতে বসে হুড়কো খা।

আতঙ্কের মুহূর্তে যুক্তিবুদ্ধি মুছে যায়। কেন সে ফাঁসবে, কীভাবে বিপদে পড়বে, পুলিশই বা কেন তাকে গারদে পুরবে, অতশত এখন তলিয়ে ভাবার ক্ষমতা নেই তাপসের। একটা ভয় থেকে আর একটা ভয়, সেখান থেকে আর একটা, ধেয়ে আসছে পর পর। আত্মীয় বন্ধু অফিস তো পরের কথা, পর্ণার সামনে তাপস দাঁড়াবে কোন মুখে? তাদের এতদিনকার নিখুঁত নিশ্চিন্ত জীবন.......হ্যাঁ, ছোটখাটো ঘরোয়া খাঁচখোঁচগুলো বাদ দিলে নিশ্চিন্তই তো বলা যায়। সব কটা থিয়োরি মেনে চলা মোটামুটি সুখের সংসার। পর্ণাও হয়তো লজ্জায় ঘেন্নায় অপমানে রাত্রির মতোই কিছু একটা করে বসবে! তারপর? বুম্‌বা? সে তো আর শিশুটি নেই, সবই জানতে পারবে। বুম্‌বা কি কখনও ক্ষমা করতে পারবে তার বাবাকে?

পায়ের নীচে পৃথিবীটা দুলছে। ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি? তাপস নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। লাবডুব লাবডুব নয়, ধড়াস ধড়াস। যেন কেউ নেহাই পিটছে। ধড়াস ধড়াস।

ইশ্‌, কী কুক্ষণে যে তাপস রাত্রির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল!

তাপস মরিয়া হয়ে চোয়ালে চোয়াল কষল। ভেঙে পড়লে চলবে না, শক্ত হতে হবে এখন। দাঁড়াতে হবে বিপদের মুখোমুখি। প্রকৃত সর্বনাশটাকে আটকাতেই হবে।

কোনটা যে প্রকৃত সর্বনাশ?

রাত্রির মারা যাওয়া? না তাপসের নিজস্ব বিপন্নতা?

তাপস গুলিয়ে ফেলল।

চার

হাসপাতালের মেন গেট দিয়ে ঢুকছে গাড়ি।

তাপসের দৃষ্টি গেঁথে গেল এমারজেন্সির সামনে। পর্ণা। পাশে দু-তিনজন আধচেনা মহিলা। পর্ণা এর মধ্যে টালিগঞ্জ থেকে এসে পড়ল?

বাদামি মারুতিখানা দেখেই পর্ণা দৌড়ে এসেছে। ফ্যাকাশে, নিরক্ত মুখ। গাড়ির দরজা ধরে ঝরঝর কেঁদে ফেলল,—নেই।

স্টিয়ারিং-এ কাঠ হয়ে বসে থাকা তাপস অস্ফুটে বলল,—কখন?

—এখানে আনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। এমারজেন্সিতে।

মৃত্যুসংবাদটা পলকের জন্য তাপসের অনুভূতিকে অসাড় করে দিল। পলকের জন্যই। পরমুহূর্তেই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কুনকুন করে উঠেছে, যা রে শালা, জোর বেঁচে গেলি এ যাত্রা। চটপট মরে তোকে অনেক অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল রাত্রি। নিশ্চয়ই মেয়েটা কাউকে কিছু বলে যায়নি। তেমন কিছু হলে পর্ণার চোখে কান্নার বদলে আগুন থাকত।

তাপস নিজেকে সুস্থিত করল। শান্তভাবে পার্ক করল গাড়ি, লক করল দরজা। এখন কোনও উত্তেজনা নয়, ঠাণ্ডা রাখতে হবে মাথা। পর্ণা কাঁদছিল, হাত রাখল তার কাঁধে। বলল,—বি স্টেডি।

—পারছি না গো। বুকটা হু হু করছে। মেয়েটা এমন বেঘোরে চলে গেল?

—ওসব পরে ভাবা যাবে। এখন এখানকার রিচুয়ালগুলো তো করতে হবে আগে।......রাত্রি কোথায়?

—এখনও এমারজেন্সিতেই আছে। যাও না, গিয়ে দেখে এসো।

কী দেখতে যাবে তাপস? কী লেখা থাকবে রাত্রির নিথর মুখে? বিষাদ? অভিমান? নাকি হঠাৎ ঠেলে ওঠা কোনও খ্যাপামি?

বিষণ্ণতার কথা কেন মনে হলো তাপসের? রাত্রি কাল খানিকটা আনমনা ছিল বটে, তবে পরে তো বেশ চনমনেও হয়ে উঠেছিল। অবসন্ন বিষাদক্লিষ্ট বলে মনে হয়নি তো একবারও! বরং সমান ভাবেই তো অংশ নিল শরীরী খেলায়। মনে হচ্ছিল যেন সুখে গলে গলে যাচ্ছে!

তাহলে কি অভিমান? কিন্তু তাই বা কিসের? কার ওপরই বা অভিমান? তাপস?

আজকাল মাঝে মাঝেই রাত্রি বলত,—এভাবে আর কদ্দিন চলবে তাপসদা?

—কেন? আটকাচ্ছে কোথায়?

—তুমি বুঝবে না।

—বোঝালেই বুঝব।

—সব সম্পর্কের একটা পরিণতি থাকে তাপসদা। কোথাও একটা গিয়ে থামতে হয়।

নারী-পুরুষের সম্পর্কের পরিণতি মানে কী? বিয়ে? তা যে সম্ভব নয় রাত্রির তো আগাগোড়াই জানা ছিল। এমন একটা অসম্ভব কারণে রাত্রির বুকে অভিমান জমবেই বা কেন? শুধু জমে ওঠা নয়, অভিমানটা রাত্রিকে ঠেলতে ঠেলতে মৃত্যুর দিকে নিয়ে গেল? নাকি পরিণতি বলতে সম্পর্কে দাঁড়ি টানার ইঙ্গিতই দিতে চেয়েছিল রাত্রি? খোলসা করে বলল না কেন? যত কষ্টই হোক, তাপস নিজেই সরে যেত। যেতই। সে এত অমানুষ নয় যে রাত্রির অনিচ্ছেতেও তাকে একটা নিজস্ব পছন্দসই সম্পর্কের গণ্ডিতে বেঁধে রাখবে। এমন একটা বীভৎস নাটক করার প্রয়োজন ছিল কী?

না, না, বিষাদ নয়, অভিমানও নয়, এ শুধুই একটা ঠেলে ওঠা পাগলামি। পরিকল্পনা মাফিক কিছু করেনি রাত্রি, চকিত কোনও উত্তেজনাতেই ঘটিয়ে ফেলেছে কাণ্ডটা। সব মানুষের মধ্যেই তো একটা উন্মাদ বাস করে, তাকে সামলে সুমলে রাখাটাই তো মানুষের বেঁচে থাকা। ওই উন্মাদই বোধহয় রাত্রিকে মৃত্যুর চোরা গর্তে ঠেলে দিল।

আশ্চর্য, মরার আগে একবারও তাপসের কথা ভাবল না রাত্রি?

তাপসের ভালোবাসাটাকে রাত্রি উপেক্ষা করল?

ভার গলায় তাপস বলল,—থাক গে, আমি আর দেখব না।

পর্ণা কী বুঝল কে জানে, আলতো মাথা নাড়ল,—হুম্, না দেখাই ভালো। দেখা মানেই তো খারাপ লাগা। কষ্ট পাওয়া।

পর্ণার ছোটমামা বেরিয়ে আসছে এমারজেন্সি থেকে। বছর পঞ্চাশের সোমনাথের মুখে ঈষৎ উদভ্রান্ত ভাব। তাপসকে দেখে যেন হালে পানি পেল,—এই যে, এসে গেছ! .....চলো, ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

—কী কথা?

—বডি তো এবার মর্গে পাঠাবে। গিয়ে একটু তাড়া-ফাড়া না দিলে......

'বডি' শব্দটা ঠং করে কানে বাজল তাপসের। কাল ঠিক এই সময়ে রাত্রি কী ভীষণ জীবন্ত ছিল, মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার তফাতে সে এখন নিছকই একটা বডি!

তাপস ঘড়ঘড়ে গলায় বলল,—আপনি কতক্ষণ?

—তা প্রায় মিনিট চল্লিশ। সোমনাথ ঘড়ি দেখল,—পর্ণার ফোন পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই তো....। এখানে এসে একবার এদিকে ছুটছি, একবার ওদিকে ছুটছি। কী সব ক্যালাস অ্যাটিচিউড এখানকার লোকজনের, কেউ কোনও ডেফিনিট উত্তর দেয় না।

আপনা-আপনি তাপসের চোয়াল শক্ত হলো একটু। পর্ণার এই মামাটি যত না করে তার চেয়ে গান গায় বেশি। তবে তাড়াতাড়ি যে এসেছে এই না অনেক। পর্ণা নিশ্চয়ই কলকাতার আত্মীয়স্বজনদের সবাইকে জানিয়েছে, কই এখনও তো কারুর দেখা নেই!

গোমড়া গলায় তাপস বলল,—সত্যি, আগে এসে পড়েছেন বলে আপনাকেই ছোটাছুটিটা করতে হলো।

—সেটা কোনও ব্যাপার নয় তাপস। এমন একটা বিপদে পাশে তো দাঁড়াতেই হবে। .....এখন আর কী করা দরকার সেটা বলো।

পর্ণা বলে উঠল,—শুভামাসিকে একটা খবর পাঠাতে হবে। এক্ষুনি।

—শুভাদিকে ফোন করতে হলে তো সেই পাশের বাড়ি। তোর কাছে নম্বরটা আছে?

—আছে। পর্ণা নাক টানল,—এনেছি।

—ফোনে জানাতে পারলেই বেস্ট হয়। নইলে তো সেই থানার থ্রু দিয়ে মেসেজ পাঠাতে হবে। আই মিন পুলিশ মারফত।

পুলিশ শব্দটাতেই যেন একটা চোরা শিরশিরানি ভাব আছে। ভেতরে ভেতরে তাপস বেশ কেঁপে গেল। এই মুহূর্তে পুলিশের মুখোমুখি হওয়ার তার কণামাত্র বাসনা নেই। যদি কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ে!

পর্ণা ব্যাগ ঘেঁটে নম্বর খুঁজছে। অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা রাত্রির হোস্টেলের কয়েকজন পায়ে পায়ে কাছে এল। সর্বাগ্রে হোস্টেলের ডেপুটি সুপার। মহিলাকে ভালো মতোই চেনে তাপস। মোটেই সুবিধের নয়। ফোনে রাত্রিকে ডেকে দিতে বললে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বিস্তর জেরা করে। উঁহু, করত। রাত্রি তো এখন পাস্ট।

মোটাসোটা চেহারার ডেপুটি সুপার যূথিকা সিংহর বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ। বিয়ে

থা হয়নি মহিলার, চোখে সর্বক্ষণ ঘোরাফেরা করে এক কুটিল সন্দেহ। সেই চোখেই তাপসের দিকে তাকিয়েছে যূথিকা,—কী বিচ্ছিরি কাণ্ড হয়ে গেল বলুন তো?

তাপস দ্রুত মাথা নাড়ল,—হ্যাঁ, খুবই আনফরচুনেট। অকল্পনীয়।

—সকালেও কিছু টের পেতে দেয়নি, জানেন। ডাইনিংহলে এসে চা-বিস্কুট খেয়েছে, কাজে যাবে বলে স্নানে ঢুকেছিল......

সোমনাথ বলল,—কিন্তু মেয়েটা অ্যাসিড পেল কোথ্থেকে?

যূথিকার ভুরু জড়ো হলো। যেন বুঝে নিতে চাইল দোষের তীরটা তাদের দিকেই ছোঁড়া হচ্ছে কিনা। আত্মরক্ষার ভঙ্গির সঙ্গে আক্রমণ মিশিয়ে বলল,—কী করে জানব বলুন! আমরা তো আর হোস্টেলে অ্যাসিড সাজিয়ে রাখি না। জমাদার সপ্তাহে একদিন আসে, আমাদের কাছ থেকে বোতল চেয়ে নিয়ে যায়, বাথরুম সাফসুতরো করে আবার রেখে যায় স্বস্থানে। অফিসে। সে বোতল যথা জায়গায় আছে। আমরা চেক করে নিয়েছি।

পিছন থেকে বছর পঁয়ত্রিশের এক হোস্টেলবাসিনী বলে উঠল,—রাত্রি বাইরে থেকেই কিনে এনেছিল। সকালে তো বেরিয়েছিল একবার। অনেকেই দেখেছে।

—শুনলেন তো? আরে যার মরার সাধ জাগে সে নিজেই সব জোগাড় করে নেয়। একে বলে নিয়তির লীলা। যূথিকার সন্দিগ্ধ মুখে এবার দুঃখী দুঃখী ভাব ফুটেছে,—উফ্, ভাবতে পারবেন না কী প্যাথেটিক দৃশ্য! মেয়েটা বাথরুম থেকে বেরোচ্ছে না, সাড়া না পেয়ে সবাই দরজা ধাক্কাচ্ছে....ভাগ্যিস ছিটকিনিটা পল্‌কা ছিল, তাই দরজা ভাঙতে হলো না। একটা দরজা সারানো মানে তো এখন কমসেকম দুশো টাকার ধাক্কা। কাঠের মিস্ত্রি কান মুচড়ে একদিনের রোজ নিয়ে যাবে।

আচ্ছা হার্টলেস মহিলা তো! মেয়েটা মরে গেল তাই নিয়ে শোক নেই, মহিলার *চিন্তা দরজা সারানোর খরচা নিয়ে!*

যূথিকা একই দমে বলে চলেছে,—দরজা খুলে যেতেই দেখি মেয়েটা মেঝেতে উপুড় হয়ে কুঁকড়ে মুকড়ে পড়ে আছে, সাদা সাদা গাঁজলা বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে, পাশে গড়াগড়ি খাচ্ছে অ্যাসিডের বোতল।

—তখনও কিন্তু জ্ঞান ছিল। সালোয়ার কামিজ পরা আর একটি মেয়ে খেই ধরল,—গঁ গঁ শব্দ করছিল মুখে। আর হাত-পাগুলো কাঁপছিল থরথর করে। কনভাল্‌শান মতো হচ্ছিল।

—অ্যাম্বুলেন্সে আসার সময়ও তো ঠোঁট নড়ছিল রাত্রির। মনে হচ্ছিল কী যেন বলতে চায়, কাকে যেন খুঁজছে।

—তখনও ভেবেছিলাম স্টমাক ওয়াশ- টোয়াশ করলে বেঁচে যাবে এ যাত্রা।

—কী যে বলেন যূথিকাদি, ওই অ্যাসিড পেটে গেলে কেউ বাঁচে? নাড়িভুঁড়িসুদ্ধু গলে যায়।

—তবে ধন্যি মেয়ের সহ্যশক্তি। একবারও সেভাবে কাতরাল না!

—মেয়েদের সহ্যশক্তি একটু বেশিই হয়। মেয়েজন্ম তো সহ্য করার জন্যই।

—ঠোঁটদুটো কীরকম সাদা হয়ে গিয়েছিল লক্ষ্য করেছিলেন?

—জিভও একেবারে ফ্যাটফেটে সাদা। মনে হচ্ছিল কেউ চুন মাখিয়ে দিয়েছে।

ওফ্, এই কুৎসিত বর্ণনা কি থামবে না? তাপসের অসহ্য লাগছিল। আবার সঙ্গে সঙ্গে একটু যেন নির্ভরও লাগছে নিজেকে। রাত্রির শেষ মুহূর্তের সঙ্গিনীদের বাক্যালাপ থেকে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় রাত্রি কারুর কাছেই মুখ খোলেনি। তাপস রে, তুই বোধহয় বেঁচে গেলি।

কথা বলতে বলতেই যূথিকা সোমনাথের দিকে ফিরেছে,—পোস্টমর্টেম তাহলে হচ্ছেই? আটকানো গেল না?

সোমনাথ হাত ওল্টালো,—আন্ন্যাচারাল ডেথ, পুলিশ-কেস, যা নিয়ম তা তো মানতেই হবে।

—আজ কি বডি পাওয়া যাবে?

—কী করে বলব, কিছুই তো আর আমাদের হাতে নেই।

—কিছুই কারুর হাতে থাকে না, তবু ঝামেলাটা পোয়াতেই হয়। যূথিকার গলায় ঝাঁঝ ফুটল,—এই যে মেয়েটা দুম করে মরে গেল, এতে আমাদের কী হাত ছিল বলুন? ইনফ্যাক্ট, মেয়েটাকে আমরা কতটুকুই বা চিনতাম! আর পাঁচটা মেয়ের মতো রাত্রিও তো ছিল সিম্পলি একটা বোর্ডার। টাকা দেয়, থাকে, চাকরি-বাকরি করে.....সে যে মনে মনে কী প্ল্যান ভাঁজছে আমরা বুঝবটা কী করে? অথচ ফাঁসলাম আমরাই তো সব থেকে বেশি। কত লোক আজ হোস্টেলে জড়ো হয়ে গিয়েছিল জানেন? সবাই কৌতূহল দেখাচ্ছে। এই প্রশ্ন, সেই প্রশ্ন......। লোকালিটিতে আমাদের কী পজিশান হলো ভাবুন তো? আমাদের গুডউইলের তো দফারফা। এরপর আবার পুলিশ আসবে, জেরা করবে....। বলতে বলতে যূথিকার দৃষ্টি তাপসের দিকে,—কিছু মনে করবেন না মিস্টার মিত্র, আমাদের এই হ্যারাসমেন্টের পেছনে আপনারও দায় আছে।

তাপস বিবর্ণ স্বরে বলল,—আমার?

—আপনি ওর লোকাল গার্জেন ছিলেন। ওর যে একটা মেন্টাল প্রবলেম চলছিল, আপনাদের অন্তত খোঁজ রাখা উচিত ছিল।

—আহা যূথিকাদি, উনি কী করবেন? উনিও কি জানতেন মেয়েটা এরকম করে বসবে?........মেয়েটার যে কোনও মানসিক সমস্যা চলছে সে তো আমরাও বুঝতে পারিনি।

—দেখে তো কিছুই বোঝা যেত না। এমনিতেও ও ছিল কী শান্ত ভদ্র.......

—ব্যবহারটাও ভারী মিষ্টি ছিল। কখনও কারুর সঙ্গে গলা উঁচু করে কথা বলত না।

—তবে খুব চাপা ছিল। কারুর সঙ্গেই মিশত-টিশত না।

—ওর চাকরির জায়গায় কোনও গণ্ডগোল হয়নি তো?

—হতেও পারে। খোঁজ নিলেই জানা যাবে।

—কাকলি তো ওর রুমমেট, কাকলি হয়তো কিছু ইনফরমেশন দিলেও দিতে পারে। সকাল-সন্ধে কাছ থেকে দেখেছে ওকে।

—কাকলির সঙ্গেও তেমন ইন্টিমেসি ছিল না, আমি জানি।

—তা হয়তো ছিল না। তবে কাকলি আমায় একদিন বলছিল.....। সালোয়ার কামিজ ঝপ করে থেমে গেল।

পর্ণা ফ্যালফ্যাল চোখে তাকাল,—কী বলছিল?

—রাত্রি নাকি হঠাৎ হঠাৎ দু-তিন দিনের জন্য বেপাত্তা হয়ে যেত। উইকএন্ডে। উইকের মধ্যিখানে। বলত বটে বাড়ি যাচ্ছি, তবে কাকলির ধারণা ও যেত অন্য কোথাও। সম্ভবত কেউ একজন ছিল ওর। মানে স্পেশাল কেউ।

—যাহ্, কাকলি জানল কী করে? কিছু দেখেছিল?

—সে কথাও জিজ্ঞেস করেছিলাম। কাকলি বলল, কণিকা আমরা মেয়ে, শুধু চোখ আর হাবভাব দেখেই আমরা অন্য মেয়ের অনেক সিক্রেট পড়ে নিতে পারি।

—তাহলে দ্যাখো হয়তো কোনও বদলোকের পাল্লাতেও পড়ে থাকতে পারে।

—সেটার চান্সই বেশি। কলকাতা হলো গিয়ে হাঙর-কুমীরদের শহর। রাত্রি বেচারা সাদাসিধে মফস্বলের মেয়ে, হয়তো ওকে কেউ প্রেমের টোপ-ফোপ দিয়ে, ইউজ করে........

—হতেই পারে।

—লোকটাকে ধরতে পারলে ছাল ছাড়িয়ে নিতাম। যূথিকা গজগজ করে উঠল,—বজ্জাত পুরুষমানুষগুলোর জ্বালায়......

—আহ্, আপনারা থামবেন? পর্ণা হঠাৎ প্রায় চিৎকার করে উঠেছে,—আমি আমার বোনকে চিনি। ও আমার কাছে কিছু লুকোত না। কারুর সঙ্গে রিলেশান হয়ে থাকলে ও নিশ্চয় আমাকে জানাত। ওর মতো একটা সরল পবিত্র মেয়ে.....

—সরল পবিত্র মেয়েরাই তো আগে ফাঁদে পড়ে ভাই। পুরুষরা তো ওই ধরনের মেয়েদেরই বেশি টার্গেট করে।

আলোচনা ক্রমশ মারাত্মক দিকে মোড় নিচ্ছে। তাপসের গলা শুকিয়ে আসছিল। শিরায় রক্ত চলাচল যেন দ্রুত হয়ে গেছে সহসা। পর্ণার হাতের চাপে চমকে উঠল। অপ্রসন্ন মুখে ঠেলছে পর্ণা,—কী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফালতু কথা গিলছ? এখন কি এসব শোনার সময়? একবার যাও না সুপারের কাছে। ছোটমামাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও, দ্যাখো বলে কয়ে যদি তাড়াতাড়ি কাজগুলো মেটাতে পারো।

তাপসের ন যযৌ ন তস্থৌ দশা। ইচ্ছে করছে ছিটকে সরে যেতে, কিন্তু পা যেন নড়তে চায় না। এই সব ঘোঁট পাকানো মহিলারা বিদায় নেয় না কেন? এদের মাঝে পর্ণাকে একা ছেড়ে যাওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? কোন কথা থেকে কী যে বেরিয়ে আসে! পর্ণাও কি তাকে হঠাতে চাইছে? আলাদা করে আরও কিছু শুনে নিতে চায়? মনে কোনও খটকা লেগেছে কি পর্ণার?

দোলাচলে ভুগতে ভুগতে শেষ অবধি সুপারের ঘরের উদ্দেশে এগোল তাপস। সঙ্গে সোমনাথ। পাশ দিয়ে এক ঝাড়ুদার নিস্পৃহ ভঙ্গিতে ময়লা ঝাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ধুলোর ঝাপটা এসে লাগল মুখে। হাসপাতালের নিজস্ব কটু গন্ধে নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে। সোমনাথ মুখে রুমাল চেপেছে। তিন-চারজন লোক এক বৃদ্ধকে স্ট্রেচারে নিয়ে হৈহৈ রবে ধেয়ে আসছে, তাদের রাস্তা করে দিতে একপাশে সরে দাঁড়াল দুজনে।

আচমকা সোমনাথ বলে বসল,—তোমার কী মনে হয় তাপস?

থতমত খাওয়া মুখে তাপস বলল,—কী ব্যাপারে?

—ওই যে, হোস্টেলের ওরা যা বলছিল....। সত্যি কি কোনও বাজে লোকের পাল্লায় পড়েছিল রাত্রি?

তাপসের মুখে জবাব ফুটল না।

সোমনাথই আবার বলল,—আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না। আই থিংক পর্ণা ইজ রাইট। তেমন কোনও ব্যাপার-স্যাপার থাকলে তোমরা কি একটুও আঁচ পেতে না? আফটার অল তোমাদের সঙ্গেই তো রাত্রির রিলেশান সব চেয়ে ডিপ ছিল। আমাদের সঙ্গে ও তো প্রায় যোগাযোগই রাখত না।

তাপসের মুখ ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, কেন রাখবে? কোন আশায়? আজ মেয়েটা মরার পর সোমনাথের দর্শন মিলেছে বটে, কিন্তু জীবিতকালে এই মামাটি কি ভুলেও খোঁজখবর নিয়েছে ভাগ্নীর? সব সময়ে তো ভয়ে ভয়ে থাকত এই বুঝি মেয়েটা কোনও সাহায্য চাইল, এই বুঝি আস্তানা গাড়ল বাড়িতে!

এমারজেন্সির দরজায় পৌঁছে সোমনাথ ফের বলল,—কারণ যাই থাক, রাত্রির

কিন্তু এভাবে মরাটা উচিত হয়নি। যা হোক করে সংসারটা তো তাও টানছিল। এবার শুভাদির কী অবস্থাটা হবে ভাবো তো!

তাপস ভাঙা ভাঙা গলায় বলল,—ও প্রসঙ্গগুলো এখন থাক না মামা।

—থাক বললে কি পৃথিবী থেমে থাকবে? রইল কী? বাকিরা এখন খাবে কী?

শুধু সংসারের ঘানি টানার জন্যই রাত্রির বেঁচে থাকা উচিত ছিল, এটা কি একটু বেশি স্বার্থপর ভাবনা নয়? শুধু নিজের জন্য বেঁচে থাকার কি কোনও অধিকার ছিল না রাত্রির? কিংবা মরে যাওয়ার?

সুপারিন্টেণ্ডেন্টের ঘর এসে গেছে। পরদা সরিয়ে তাপস আলগোছে উঁকি দিল ভেতরে। মধ্যবয়স্ক সুপার ফাইল ঘাঁটছে। টেবিলের সামনে দু-তিনটে লোক, সম্ভবত হাসপাতালেরই কর্মচারি।

তাপস গলা খাঁকারি দিল,—স্যার, আমাদের কেসটা........?

সুপার ঘাড় তুলল। চোখ ঘুরিয়ে সোমনাথকে দেখে নিল এক ঝলক। পরক্ষণেই ভুরুতে কুঞ্চন,—আপনাদের তো অ্যাসিড পয়জনিং-এর কেস? বললাম তো বডি মর্গে চলে যাচ্ছে।

—আজ কি হয়ে যাবে?

—কাঁটাপুকুরে চলে যান না। গিয়ে দেখুন। যদি বলে কয়ে চটপট করিয়ে নিতে পারেন। বলতে বলতে ঘড়ি দেখল সুপার,—আমার মনে হয় আজ চান্স খুব কম। বডি ওখানে পৌঁছতে পৌঁছতেই পাঁচটা বেজে যাবে। তারপর কি আর কাউকে পাবেন ওখানে!

—তার মানে কাল?

—হ্যাঁ, কালই ধরে রাখুন। বাই দা বাই, একটা আইডেনটিটি সার্টিফিকেট সঙ্গে নিয়ে যাবেন। নইলে কিন্তু পুলিশ বডি হ্যান্ডওভার করবে না।

—সার্টিফিকেট?

—ইয়েস। আপনাদের মধ্যে যিনি বডিটি নেবেন, তিনি যে মৃতের আপনজন, এবং তাঁর হাতে যে বডিটি তুলে দেওয়া যায়, এই মর্মে একটি সার্টিফিকেট লেখাতে হবে। বাই সাম গেজেটেড অফিসার। অথবা লোকাল কাউন্সিলার। আর হ্যাঁ, একটা পুলিশ রিপোর্টও লাগবে মর্গে। এখানে বসে না থেকে এখন বরং থানায় গিয়ে রিপোর্টটা আগে রেডি করিয়ে নিন। ও কে?

নরম অথচ কী নির্লিপ্ত স্বরে কথা বলছে লোকটা! কলের পুতুলের মতো ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে এল তাপস। সেই থানা পুলিশের ঝঞ্ঝাটে যেতেই হচ্ছে তবে? এক্ষুনি?

কপাল!

পাঁচ

তাপস বাড়ি ঢুকল প্রায় রাত সাড়ে নটায়। হাক্লান্ত হয়ে।

হসপিটাল সুপারের কথাই ঠিক, বডি মর্গে পৌঁছল সেই সাড়ে পাঁচটায়। সেখানে তখন শুনশান দশা, ডাক্তারবাবু নেই, ডোমরা বাংলা মদের নেশায় টলটলায়মান। তাপসদের তারা আমলই দিল না, স্রেফ হাঁকিয়ে দিল। আবার সেখান থেকে ছুট ছুট ছুট। থানায়। সেখানেও কাজ হলো না, ফের যেতে হবে কাল সকালে। দশটার মধ্যে। মেজাজমর্জি ভালো থাকলে তখনই হয়তো হাতে হাতে রিপোর্ট তৈরি করে দেবে পুলিশ। তবু না আঁচালে বিশ্বাস নেই, কাল আবার কত কী হ্যাপা পোয়াতে হয় কে জানে।

একটা কাজ অবশ্য সারতে পেরেছে তাপস। নিজের পরিচয়ের শংসাপত্র বানিয়ে এনেছে, যাতে ওই কারণে রাত্রির বডি পেতে কাল অসুবিধে না হয়। বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেই গেজেটেড অফিসার ছিল এক-দুজন, তবে তাদের কাছে ছোটেনি। কে কী প্রশ্ন করবে, কার কী কৌতূহল হবে তার ঠিক কী! নিজের পাড়ায় মোটামুটি ভালোই প্রতিপত্তি আছে তাপসের, পাড়ারই একটি ছেলেকে ধরে সরাসরি কাউন্সিলারের বাড়িতে গিয়েছিল, পুরপিতার দরবারে ঘন্টাখানেক বসে থেকে জোগাড় করেছে প্রয়োজনীয় কাগজটি। যাক, একটা ঝামেলা তো কমল।

তাপস শার্টপ্যান্ট বদলাছিল। নিঃশব্দে। ড্রয়িংস্পেসের সোফায় বসে আছে পর্ণা। ঝুম হয়ে। বুম্‌বা নিজের ঘরে, পড়ার টেবিলে। সামনে বই খোলা আছে বটে, তবে তারও চোখ অদ্ভুত রকমের ফাঁকা। এক গাঢ় নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে গোটা ফ্ল্যাটে।

তাপসই প্রথম শব্দ আনল। পাজামা-পাঞ্জাবি পরে সিগারেট ধরিয়েছে একখানা। সোফায় বস্‌তে বসতে আলগা প্রশ্ন করল,—তুমি কি ট্যাক্সি নিয়ে ফিরলে?

—না। বড়দা নামিয়ে দিয়ে গেল।

—পরে আর কেউ এসেছিল হাসপাতালে?

—ছোড়দা এল। তুমি আর ছোটমামা বেরিয়ে যাওয়ার পর পরই। মুন্নিদি আর স্বপনদাও এসেছিল।

—সবাই মিলে গুলতানি করছিলে?

—তা কেন, প্রত্যেকেই খুব শকড। হায় হায় করছিল। সব্বাই।........ছোড়দা বলছিল, রাত্রি বোধহয় কোনও চক্রে-ফক্রে জড়িয়ে পড়েছিল।

—আর তোমার বড়দা কোনও কমেন্ট করেনি?

—দাদা বলছিল.....হয়তো ওই প্রেম-ট্রেম.... কেউ হয়তো ডিচ করেছে।

—হুঁহ্, জল্পনা-কল্পনার বেলায় সবাই আছে, আসল সময়ে টুঁ-টুঁ।

—ও কথা কেন বলছ? রাত্রিকে সবাই ভালোবাসত।

মাথা ফট করে গরম হয়ে গেল তাপসের। ভালোবাসা! স্নেহ! একটা ভদ্র গোছের চাকরির আশায় পর্ণার দুই দাদার কাছে কম ঘুরেছে রাত্রি! দু-ব্যাটাই ইঞ্জিনিয়ার, বড় ফার্মে চাকরি করে, চেনাজানাও আছে বিস্তর, তারা সেভাবে চেষ্টাচরিত্র করলে দায়িত্বটা কি সবটা তাপসের ঘাড়ে এসে পড়ত? রাত্রি একদিন হাউহাউ করে কেঁদেছিল—তুমি জানো, নান্টুদা-মন্টুদা আমাকে দেখলে কীরকম আঁতকে ওঠে! পরশু মন্টুদার বাড়িতে বসে আছি, শুনতে পেলাম মন্টুদা বউদিকে বলছে, রাত্রি এখানে সারাদিনের মতো বড়ি ফেলল নাকি! হাঠাও হাঠাও, ওকে বলো আমরা বেরোব! বউদি বলছে, আমাকে ভেড়াও কেন, তোমার বোন তুমিই বলো! মন্টুদাদের কিছু না বলেই আমি ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি!

এক্ষুনি যে কেন মনে পড়ল কথাটা? পর্ণার দাদাদের ওপর বিরক্তই বা হচ্ছে কেন তাপস? রাত্রির প্রতি তাদের মনোভাব তো বহুদিন ধরেই তাপসের জানা, কিন্তু এত তীব্র উষ্মা তো আগে কখনও প্রকাশ করেনি? কেন ভেঙে যাচ্ছে সংযমের বাঁধ? প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেভাবেই হোক, রাত্রির মৃত্যুর সঙ্গে সে জড়িয়ে গেছে বলেই কি? বাইরের কেউ হয়তো তাকে দায়ী করছে না, কিন্তু নিজের মন তাকে ছাড়ান দিচ্ছে কই! উল্টে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে ধরছে সর্বক্ষণ। রাত্রির ওই আত্মীয়রা যদি রাত্রির প্রতি একটু সহানুভূতিশীল হত, তাহলে তো রাত্রির সঙ্গে তাপসের সম্পর্কটা তৈরিই হত না। অর্থাৎ ওই আত্মীয়রাই তো তাপসকে প্রায় ঠেলে দিয়েছে রাত্রির দিকে। নয় কি?

হায় রে, কত ভাবেই যে মনকে চোখ ঠারে মানুষ!

উঁহু, মনকে চোখ ঠারা কেন হবে? তাপস কেন অপরাধী ভাবছে নিজেকে? নিজের মনকে বস্তুনিরপেক্ষ করার চেষ্টা করল তাপস। ব্যাপারটাকে তো এরকম ভাবেও ধরা যায়—একটা মেয়ে কলকাতায় এসে তার মাসতুতো দিদির বাড়ি আশ্রয় পেয়েছে। মেয়েটির মা থাকে কলকাতা থেকে একশো কিলোমিটার দূরে, এক মফস্বল টাউনে। হঠাৎ বাবা মারা যাওয়ার কারণে সংসারে পাকাপাকিভাবে আয়ের সংস্থান নেই, কলকাতার আত্মীয়স্বজনরা নিয়মমাফিক উদাসীন। এমত অবস্থায় মাসতুতো দিদির বরটি তাকে একটি ছোটখাটো কাজের বন্দোবস্ত করে দিল, মাসান্তে

মা ভাইবোনদের কাছে পাঠানোর মতো টাকার ব্যবস্থা করে দিল, নিজেও সে সাহায্য করে সাধ্যমতো। সাহিত্যের ভাষায় বলতে গেলে এক নিমজ্জমান পরিবারকে উদ্ধার করেছে ওই জামাইবাবু। মেয়েটির ভাইবোন এখন দু'বেলা মাংসভাত না হলেও ডালভাত অন্তত খেতে পায়, খানিকটা নিশ্চিন্ত মনে লেখাপড়া চালাতে পারছে, মা'কে আধা ভিখিরির মতো এর-ওর-তার দরজায় ঘুরতে হয় না—এই সুযোগ-সুবিধেগুলোর কোনও দাম নেই? এই পৃথিবীতে কোন দ্রব্যটি বিনে পয়সায় জোটে? বিশুদ্ধ জলের জন্যও ট্যাক্স দিতে হয়, বিশুদ্ধ অক্সিজেনের জন্যও ছুটতে হয় পারলারে। তাহলে? যে নিরাপত্তার বলয়টুকু পেয়েছে ওই সংসার, তার মূল্য চোকাবে কে? এবং কীভাবে? মূল্য ঠিকঠাক দিতে গেলে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠা উচিত, তাপসের সঙ্গে রাত্রির সম্পর্ক কি তার চেয়ে বেশি গভীর ছিল না? বয়সের অনেক তফাত থাকলেও? ভালোবাসার আস্তরণটা কি একেবারেই পাতলা? জামাইবাবু যে গোপনীয়তাটুকু বজায় রেখেছিল তা তো শুধু মাসতুতো দিদিটির সম্মান বজায় রাখার জন্য। দুর্মুখ স্বার্থপর আত্মীয়রা যাতে অশালীন ইঙ্গিত হানার সুযোগ না পায় তার জন্য। বড় হয়ে ওঠা ছেলে যেন বাবাকে অশ্রদ্ধার চোখে না দেখে তার জন্য।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? তাপস যে কেন নিজের কাছে নিজেই হোঁচট খাচ্ছে বার বার?

এক মায়াবী বিকেল তাপসের সামনে এসে দাঁড়াল সহসা। বাগনান থেকে খানিকটা গিয়ে বম্বে রোড ছেড়ে একটা আঁকাবাঁকা পথ ধরে রূপনারায়ণের পাড়ে গিয়েছিল তারা। গাড়ি থেকে নেমে হাঁটছিল। তীর ধরে। সার সার তাল গাছের মধ্যিখান দিয়ে। একসময়ে তাপস হঠাৎ দেখল রাত্রি পাশে নেই, খানিক দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

তাপস ডাকল,—দাঁড়িয়ে গেলে কেন রাত্রি?

রাত্রি সাড়া করল না। তাকিয়ে আছে নদীর দিকে। উল্টো মুখে ফিরে। একটু তফাত থেকে রাত্রির শরীরের আদলটুকু দেখতে পাচ্ছিল তাপস। বেতের মতো ছিপছিপে সতেজ শরীর। তাপসের বহুবার ব্যবহার করা চেনা শরীর। তখনই কোথ্‌থেকে দুটো খ্যাপা মোষ দিকভ্রান্তের মতো দৌড়ে রাত্রির একেবারে কাছে এসে পড়ল।

তাপস চেঁচিয়ে উঠেছিল,—রাত্রি, সাবধান। সরে যাও, সরে যাও।

রাত্রি ঘুরেও তাকায়নি।

আপনা আপনিই চলে গেল মোষ দুটো।

তাপস দৌড়ে পাশে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল,— তোমার কি ভয়ডর নেই? সামনে নদী, পেছনে ওরকম দুটো জন্তু.....?

রাত্রি একদৃষ্টে দেখছিল তাপসকে। উঁহু, দেখছিল না। সেই মুহূর্তে রাত্রির চোখে হাসি বিষাদ আশা নিরাশা তাপস নদী মোষ কিছুই ছিল না। সম্পূর্ণ শূন্য দৃষ্টি।

তাপস বিড়বিড় করে উঠেছিল,—অ্যাই রাত্রি, কী দেখছ ওভাবে? কিছু বলছ না কেন? মোষদুটোকে দেখেও তুমি দাঁড়িয়ে রইলে? ভয় পেলে না?

চোখের ভাষা এতটুকু বদলাল না রাত্রির। শুধু ঠোঁটের কোণে মৃদু একটা হাসি ফুটে উঠল,—ভয়? কই, না তো!

সেদিন ওভাবে কেন তাকিয়েছিল রাত্রি? ওই দৃষ্টির কী অর্থ? ওই দু-চোখ কি পরখ করছিল ধেয়ে আসা যমদূতের হাত থেকে তাপস তাকে রক্ষা করে কিনা? নাকি মৃত্যুভয়টাই তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল? তখন থেকেই ক্ষয়ে যাচ্ছিল বাঁচার আকাঙক্ষা? সেই থেকেই কি শুরু?

ওফ্, তাপস যে কেন স্মৃতিহীন হতে পারছে না?

পর্ণা উঠে গেছে। রান্নাঘর ঘুরে ছেলের ঘরে ঢুকল। ফের এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। অস্ফুটে বলল,—কী যে করি ভেবে পাচ্ছি না।

—উঁ? তাপসের চটকা ভাঙল। নড়ে বসে বলল,—কী ব্যাপারে?

—তোমার কী মনে হয়, শুভামাসিরা আজ রাত্তিরে আর আসবে?

—আমি তো ফোনে বারণই করে দিলাম। যাদের বললাম তারা শুভামাসিকে গিয়ে কী বলে না বলে.....

—না এলেও তো ওখানে খুব ছটফট করবে সারা রাত।

—হুম্।

একটুক্ষণ গাঢ় নৈঃশব্দ্য। কেউই যেন আর কথা খুঁজে পাচ্ছে না। পর্ণা একবার বসল, আবার দাঁড়াল। অকারণে গলা নামিয়ে বলল, —চলো, খেয়ে নাও।

তাপস মাথা দোলাল,—ইচ্ছে করছে না।

—সে তো আমারও ইচ্ছে করছে না। তবু কিছু তো পেটে দিতে হবে। তোমার এত ধকল গেল, সকালে উঠে আবার তো ছোটাছুটি আছে...

—বুম্বা খাবে না?

—খেতে চাইছিল না, ওকে জোর করে খাইয়ে দিয়েছি। মাসির সঙ্গে ওর তো খুব ভাব ছিল, বেচারা অসম্ভব আপসেট হয়ে পড়েছে।

—হওয়ারই তো কথা। তাপস একটা বড়সড় শ্বাস ফেলল,—আমরাই বলে ধাক্কাটা সামলে উঠতে পারছি না।

পায়ে পায়ে ডাইনিং টেবিলে এসে বসল তাপস। রুটি আব মুরগির ঝোল সাজিয়ে দিচ্ছে পর্ণা। খাবারের দিকে তাকাতেই ইচ্ছে করছিল না তাপসের। আজব

এক অনুভূতি শরীরে। একদিকে প্রচণ্ড খিদেয় জ্বলে যাচ্ছে নাড়িভুঁড়ি, অন্য দিকে গা গুলিয়ে বমি উঠে আসছে।

পর্ণা রুটির একটা কোণ নখ দিয়ে খুঁটতে খুঁটতে বলল,—আমাদেরই ভুল হয়েছে। ওকে হোস্টেল-ফোস্টেলে যেতে দেওয়া উচিত হয়নি।

তাপস সাবধানী গলায় বলল, —বারণ তো করেছিলাম। না শুনলে কী করব?

—জোর করা উচিত ছিল। এখানে থাকলে চোখে চোখে তো থাকত।

জোর করেনি বলে পর্ণারও কি অনুশোচনা হচ্ছে একটু? সেও কি মনে মনে একটু দায়ী করে ফেলছে নিজেকে?

পর্ণাই ফের বলল,—আমার কী মনে হয় জানো?

—কী?

—সবাই যা বলছে সেটাই ঠিক। মেয়েটা নিশ্চয়ই কারুর একটা পাল্লায় পড়েছিল। আর সেটা হয়তো এ বাড়িতে থাকতে থাকতেই। হয়তো আমার চোখে ধরা পড়ার ভয়েই দুম করে হোস্টেলে চলে গেল।

তাপস চুপ।

—ইস্, ঘুণাক্ষরেও যদি আঁচ করতে পারতাম!.....ঠিক খুঁজে খুঁজে বার করতাম লোকটাকে।

তাপস এবারও নীরব।

পর্ণা আপন মনে বলল, —আমার কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না রাত্রি ব্যাপারটা গোপন রেখেছিল কেন? ও কাউকে ভালোবাসলে, বিয়ে করলে আমরা তো খুশিই হতাম। নির্ঘাৎ কোনও লুচ্চা লাফাঙ্গার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল, যার কথা আমাদের বলা যায় না। কিংবা কোনও ম্যারেড লোকটোক।

সবে খাওয়াটা শুরু করেছিল, হাত থেমে গেল তাপসের। পেট মুচড়ে বমিটা উঠে আসতে চাইছে, ঢোঁক গিলে কোনওক্রমে সামলাল নিজেকে। হঠাৎই মনে হচ্ছে পাখাটা যেন ঘুরছে না সেভাবে, গরম লাগছে ভীষণ।

পর্ণাও এতক্ষণে লক্ষ্য করেছে তাকে। চোখ স্থির করে বলল,—কী হলো তোমার? শরীর খারাপ লাগছে? এত ঘামছ কেন?

তাপস দু'দিকে মাথা নাড়ল, —না না, ঠিক আছি।

—সত্যি, তোমার আজ বড্ড স্ট্রেইন গেল।

—হুম্।

—খাও যা হোক কিছু। হাত গুটিয়ে বসে থেকো না।

—খাচ্ছি।

—মেয়েটা সত্যি এমন একটা কাজ করে বসল! চুনকালি পড়ে গেল তোমার আমার মুখে।

—হুম্।

—কী এমন হয়েছিল যে কাউকে এসে বলতে পারলি না! পর্ণা একটু থামল। তারপর চোখ কুঁচকে বলল,—প্রেগনেন্ট-টেগনেন্ট হয়ে গিয়েছিল, না কী?

গোটা ফ্ল্যাটের সব কটা আলো যেন দপ করে নিবে গেল তাপসের চোখের সামনে থেকে। গত মাসেই রাত্রি এরকম একটা কথা বলেছিল না?

খুবই চিন্তিত মুখে হঠাৎই বলেছিল,—আমার নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয় তাপসদা। আমরা বোধহয় ন্যায় কাজ করছি না।

—ন্যায় অন্যায় জানি নে জানি নে জানি নে। তাপস তখন রাত্রির শরীরে মাতাল। ডুবছে। স্খলিত স্বরে গুন গুন গেয়ে উঠেছিল,—শুধু তোমারে চিনি, তোমারে চিনি, ওগো নিশীথিনি.....

—বি সিরিয়াস তাপসদা। বিশ্বাস করো, আমার আজকাল কেমন ভয় ভয় করে। খালি মনে হয় পর্ণাদির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছি। তোমাদের বাড়ি যেতে পা কাঁপে। গেলে বুম্বার চোখের দিকে পর্যন্ত তাকাতে পারি না।

—এ তোমার ফালতু কমপ্লেক্স।

—না, কমপ্লেক্স নয়। সত্যি আমার এখন বড্ড ভয় করে। ধরো যদি কিছু হয়ে যায়?

—কী আবার হবে?

—বোঝো না, মেয়ে হয়ে জন্মানোর কত ঝামেলা? যদি কন্‌সিভ করে বসি.........? পর্ণাদির কাছে আমি মুখ দেখাব কী করে?

—মানে? তাপসের চোখ সরু,—তেমন কিছু হয়েছে নাকি?

—হতে কতক্ষণ? ধরো যদি হয়......?

মুহূর্তের জন্য মুখ পাংশু হয়ে গিয়েছিল তাপসের। একদৃষ্টে রাত্রিকে যেন পড়ল একটুক্ষণ। তারপর জোর করে হেসে উঠেছিল, —তুৎ, আজকালকার দিনে এটা একটা প্রবলেম নাকি! হাজার রকম ওষুধ আছে, লক্ষটা নার্সিংহোম.........অ্যাবরশান তো আজকাল জলভাত।

—না আআ। রাত্রির স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে বেজে উঠেছিল।

—কী না?

—আমি বাচ্চা নষ্ট করব না।

—কেন?

—যদি কেউ আসে তো আসবে।

—তারপর?

—তারপর তো আমার ভাবার কথা নয়। তুমি ভাববে।

মাথায় ঠং ঠং হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে তাপসের। রাত্রির কথাগুলোকে কেন যে সেদিন আমল দেয়নি? কালও রাত্রি বলছিল না, শরীরটা যুৎ নেই......! খেতেও তো চাইছিল না! তারপর কী একটা হাবিজাবি স্বপ্নের কথা বলল, কেঁদেও ফেলল হুশ করে......! তবে কি.....? তবে কি.....?

রাত্রি কি বুঝে গিয়েছিল তাপস কোনও দায়িত্বই নেবে না? তাই কি অভিমান করে চলে গেল? অথবা ভয়ে? লোকলজ্জার আতঙ্কে?

পোস্টমর্টেমে সেরকম কিছু পাওয়া গেলে পুলিশ তো ছাড়বে না, প্রচুর খোঁড়াখুঁড়ি করবে। ঠিকঠাক জেরা করলে তো জেনেই যাবে রাত্রির মৃত্যুর আগের দিন তাপসও অফিস যায়নি। কোথায় ছিল সারাদিন তার অ্যালিবাই কি তৈরি করতে পারবে তাপস? গুলতাপ্পি মেরে কি ছাড়ান পাওয়া যাবে? পুলিশ যদি ক্রসচেক করে? বাঘে ছুঁলে আঠেরো ঘা, পুলিশ ছুঁলে ছত্রিশ!

সর্বনাশ সর্বনাশ সর্বনাশ। ইশ্ তাপস কেন যে আরও সাবধানী হলো না? সপ্তাহের মাঝে রাত্রির ডাক পেয়েই তো তার বোঝা উচিত ছিল কিছু একটা গড়বড় হয়েছে।

নাহ্, তাপস আর ভাবতে পারছে না।

ছয়

পুলিশ অফিসার এক জোড়া সার্চলাইট ফেলল তাপসের মুখে,—আপনি যেন রাত্রি মজুমদারের কে হন বললেন?

তাপস গলা ঝেড়ে নিল,—জামাইবাবু।

—মানে দিদির হাজব্যান্ড?

—হ্যাঁ। মাসতুতো দিদির।

—আপনি বলছেন আপনিই রাত্রি মজুমদারের লোকাল গার্জেন ছিলেন?

—হ্যাঁ। বললাম তো। আত্মবিশ্বাস ফোটানোর জন্য গলায় একটা অতিরিক্ত জোর আনল তাপস,—বিশ্বাস না হলে হোস্টেলের রেজিস্টার দেখে আসতে পারেন।

পুলিশ অফিসার রিপোর্ট লেখার জন্য মাথা নামিয়েছিল, চোখ তেরচা করে দেখল তাপসকে। একটু রুক্ষভাবে বলল,—কোথায় কী দেখতে হবে আমরা জানি। আপনি শুধু প্রশ্নের উত্তরটুকু দিন।

তাপস শিরদাঁড়া সোজা করল,—হ্যাঁ, আমিই রাত্রির লোকাল গার্জেন ছিলাম। আই মিন লোকাল কন্ট্যাক্ট।

—হুম্। রিপোর্ট লিখতে ফের মাথা নামিয়েছে পুলিশ অফিসার। মাঝে মাঝে থামছে, ভাবছে কী যেন।

নিজেকে স্বচ্ছন্দ করার জন্য ঘরখানায় আলগা চোখ বোলালো তাপস। ঘরে আরও দুটো চেয়ার-টেবিল, একটিতে বসে এক তরুণ অফিসার একখানা ফাইল উল্টোচ্ছে আর মাঝে মাঝে পিটপিট করে তাকাচ্ছে এদিকে। অন্য টেবিলটি ফাঁকা। পুরনো নথিপত্র আর মলিন কাগজে ঠাসা ঘরখানায় বেশ কয়েকখানা কাঠের র‍্যাক। ধুলোমাখা। দেওয়ালেও ঝুল পড়েছে। দেওয়াল আলমারিতে সাঁটা একটি নোটিসে চোখ আটকাল তাপসের—অনুগ্রহ করিয়া ডায়েরি লেখার খাতা মাথায় দিয়া শুইবেন না! অন্য সময় হলে তাপস হয়তো হেসেই ফেলত, আজ তেমন কোনও প্রতিক্রিয়াই হলো না। চোরা অস্বস্তি ইন্দ্রিয়গুলোকে অসাড় করে রেখেছে।

তাপসের পাশের চেয়ারে দীপু। আজ ভোরে শুভামাসি আর পিংকিকে নিয়ে এসেছে কৃষ্ণনগর থেকে। চোখদুটো করমচার মতো লাল হয়ে আছে দীপুর। দেখেই বোঝা যায় সারা রাত ঘুমোয়নি বেচারা। কুড়ি-একুশ বছরের ছেলেটা আকস্মিক

আঘাতে কেমন যেন ধন্দ মেরে গেছে। আসার পর থেকে প্রায় কথাই বলছে না, ফ্যালফ্যাল চোখে তাকাচ্ছে আর নিঃশব্দে অনুসরণ করছে তাপসকে।

পুলিশ অফিসার কলম চালাতে চালাতে প্রশ্ন করল,—রাত্রি মজুমদারের অরিজিনাল বাড়ি তো কৃষ্ণনগরে?

তাপস অস্ফুটে বলল,—হ্যাঁ।

—ঠিকানাটা বলুন। রিপোর্টে নোট করে দিই।

তাপস দীপুর দিকে ফিরল। ইশারা বুঝতে পেরে স্বর ফুটেছে দীপুর,—আজ্ঞে, কেয়ার অফ শুভা মজুমদার, ছুতোরপাড়া, থানা কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি, কৃষ্ণনগর।

পুলিশ অফিসার ভুরু কুঁচকে তাকাল,—আপনি...?

—উনি রাত্রি মজুমদারের ভাই। খবর পেয়ে.....আজই সকালে......

—অ। ....আচ্ছা, কৃষ্ণনগর থেকে এসেই কি রাত্রিদেবী সোজা ওই হোস্টেলে উঠেছিলেন?

—না। হোস্টেলে যাওয়ার আগে ও আমাদের কাছে থাকত।

—হোস্টেলে চলে গেলেন কেন?

এই প্রশ্নের জন্য তৈরিই ছিল তাপস। স্বাভাবিক গলায় বলল,—আমাদের বাড়িতে স্পেস প্রবলেম। বোঝেনই তো ফ্ল্যাটবাড়ি, লিমিটেড ঘর, সেখানে একজন এক্সট্রা কেউ থাকলে.....

—একটা ডেলিকেট প্রশ্ন করছি, ডোন্ট মাইন্ড। রাত্রি মজুমদারের কি কোনও পুরুষবন্ধু ছিল?

—না।

—আপনি শিওর?

—হ্যাঁ।

—এত কন্‌ফিডেন্ট হচ্ছেন কী করে?

—রাত্রি আমাদের সঙ্গে খুব ফ্র্যাংক ছিল।

—সম্পর্কটা কি এতটাই ফ্র্যাংক ছিল যে পুরুষবন্ধু জুটলেও আপনাদের কাছে এসে গড়গড় করে বলে দেবে?

তাপস কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না। পুলিশ কোন কথার কী অর্থ করে তারই বা ঠিক কী!

—এমন হওয়া কি সম্ভব নয়, যে আপনাদের অজ্ঞাতেই.......?

—রিসেন্টলি কিছু হয়েছিল কিনা বলতে পারব না।

এবার পুলিশ অফিসার দীপুকে জিজ্ঞেস করল,—ভাই, আপনাকে একটা প্রশ্ন

করব? জানি আপনারা মেন্টালি খুব আপসেট হয়ে আছেন তবু.....রুটিন এনকোয়্যারি আর কি।

দীপু নিচু গলায় বলল,—বলুন?

—আপনার দিদির কৃষ্ণনগরে কোনও অ্যাফেয়ার-ট্যাফেয়ার.....?

দীপু জোরে জোরে মাথা নাড়ল,—না। দিদি চিরকালই একটু ঘরকুনো ধরনের। কারুর সঙ্গে মিশত না।

—উনি লাস্ট কবে কৃষ্ণনগরে গিয়েছিলেন?

—গত শনিবার। রোববারই চলে এসেছিল।

—তখন কি কোনও অ্যাবনরমালিটি লক্ষ্য করেছিলেন?

—তেমন বলার মতো কিছু নয়। তবে ইদানীং দিদি যেন কেমন মনমরা থাকত।

—মানে ডিপ্রেশান-টিপ্রেশান গোছের?

—সেরকম তো বুঝতে পারিনি।

—আপনার দিদির মেন্টাল ডিজিজেরও কোনও পাস্ট হিস্ট্রি আছে?

—না তো।

—দিদি কেন ইদানীং মনমরা থাকতেন জিজ্ঞেস করেছিলেন?

—না। দীপুর গলা ধরে এল, —মনে হয় আমাদের নিয়েই খুব বেশি ভাবনাচিন্তা করত। কিন্তু তার জন্য দিদি এ কাজ করে বসবে....!

—উঁহু, সুইসাইডের কারণ শুধু ফ্যামিলি প্রবলেম নয়। ওটা তো ওনার ছিলই। রিজন ইজ সামথিং এলস্। বলেই প্রসঙ্গটা থেকে সরে গেল পুলিশ অফিসার। তাপসকে প্রশ্ন করল, —আপনার স্ত্রীর সঙ্গে রাত্রিদেবীর কী রকম সম্পর্ক ছিল?

তাপস হাত উল্টোল,—ভালো। খুবই ভালো। বোনে বোনে যেমন থাকে। অত্যন্ত ইন্টিমেসি ছিল।

—আপনাদের বাড়ি উনি লাস্ট কবে গিয়েছিলেন?

—মাস খানেক আগে। না না, মাস দেড়- দুই।

—তার মানে নিয়মিত যাতায়াত ছিল না?

—প্রথম প্রথম প্রায়ই আসত। ইদানীং একটু.......। সম্ভবত অফিস-টফিস করে খুব টায়ার্ড থাকত, তাই হয়তো আর.....। আমি আর আমার স্ত্রী অবশ্য রেগুলার ফোন করতাম।

—প্রত্যক্ষ যোগাযোগটা একটু কমে গিয়েছিল, তাই তো? এবং যতটা ফ্র্যাংক থাকার কথা ততটা আর ছিলেন না? আই মিন থাকার সুযোগ ছিল না?

—হয়তো।

—হয়তো নয়, তাই। রাত্রিদেবী ডেফিনিট্‌লি কারুর সঙ্গে একটা জড়িয়ে পড়েছিলেন। এবং সেই ঘটনারই পরিণতি এই মৃত্যু।

—কী করে এত ডেফিনেট হচ্ছেন?

—দেখুন, এতদিন বাজার করছি ঝিঙে চিনব না? ধোঁয়া ছাড়া আগুন হয়? পুলিশ অফিসার গলা ওঠাল, —কী কী কারণে একটা মানুষ সুইসাইড করতে পারে? বিশেষ করে রাত্রিদেবীর মতো একজন তরুণী অবিবাহিত মহিলা? হয় তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। মানে অ্যাকিউট ডিপ্রেশানের পেশেন্ট। কিংবা শী ওয়াজ বিট্রেড বাই সামওয়ান। অথবা কেউ তার ওপর এমন একটা মানসিক চাপ তৈরি করেছিল যার জন্য উনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হন। আর একটা কারণও থাকতে পারে। চাকরির জায়গায় যদি কোনও প্রবলেম হয়ে থাকে। সেন্স অফ ইনসিকিউরিটিও মে লিড হার টু সুইসাইড। তা আপনাদের কারণ শুনে তো মনে হচ্ছে প্রথম কারণটা বাদ দেওয়া যায়। রাত্রিদেবী মেন্টাল পেশেন্ট ছিলেন না।

দীপু কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠল,—না না, দিদি কখনই মেন্টাল পেশেন্ট ছিল না। মাঝে আমাদের ওপর দিয়ে অনেক ঝড়ঝাপটা গেছে, অভাব-অনটন গেছে, তখনও দিদি যথেষ্ট স্টেডি ছিল। আমাদের গায়ে কোনও আঁচ লাগতে দেয়নি। এখন তো টাকাপয়সা নিয়েও তেমন সমস্যা ছিল না, দিদি তো ভালোই মাইনে পেত।

তাপস মনে মনে বলল, কচু পেত। তেমন কিছু পেত না বলেই তো আমি এখন ফেঁসে যাওয়ার দোরগোড়ায়।

পুলিশ অফিসার বলল,—তবু রিসেন্টলি উনি একটু মনমরা থাকতেন। কেন? উনি যেখানে কাজ করতেন সেখানে আমরা ফোন করেছিলাম। চাকরির জায়গাতেও কোনও গোলমাল হয়নি, অ্যান্ড শী ওয়াজ ভেরি মাচ ইন দ্য সার্ভিস। তাদের কাছ থেকে অ্যাডিশনাল একটা কথা অবশ্য জানলাম। মাঝে মাঝে রাত্রিদেবী নাকি ডুব মারতেন। ইনফ্যাক্ট মৃত্যুর আগের দিনও তিনি অফিস যাননি। এখান থেকেই চলে আসে সেকেন্ড হাইপোথিসিস। শী হ্যাভ সাম আদার কানেকশান্স। উইথ সামবডি। হয় কোনও ভিশাস সার্কল, নয় কোনও পুরুষবন্ধু। এবং পরশুদিনই সেখানে এমন কিছু একটা ঘটেছিল যার থেকে তিনি আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেন। রাত্রিদেবী সম্পর্কে আমরা যেটুকু খোঁজ পেয়েছি তাতে ভিশাস সার্কেলে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা কম। তাহলে ওই পুরুষবন্ধুটিই পড়ে থাকে।

—কিন্তু তার জন্য দিদি মরবে কেন?

—হয়তো লোকটা একটা ডিবচ। হয়তো রাত্রিদেবী সেটা বুঝে গিয়েছিলেন। হয়তো লোকটার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার তাঁর কোনও রাস্তা ছিল না। হয়তো অন্য কোনও কারণে যেটা পোস্টমর্টেম রিপোর্ট হাতে এলে পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাবে।

—কী থাকতে পারে রিপোর্টে? তাপসের গলা দুলে গেল,—রাত্রি যে অ্যাসিড পয়জনিং-এ মরেছে এতে তো কোনও সংশয় নেই।

—সঙ্গে মোটিভটাও তো বুঝতে হবে। যদি দেখা যায় রাত্রিদেবী প্রেগন্যান্ট ছিলেন তাহলে ব্যাপারটা একদম ক্লিয়ার হয়ে যায়। তখন জোর গলায় বলতে পারি নিশ্চয়ই সেই লোকটি রাত্রিদেবীকে ফাঁসিয়ে দিয়ে কেটে পড়ার ধান্দা করেছিল তাই.....

মুখ কালো হয়ে গেছে দীপুর। চোখটা যেন জ্বলে উঠল ক্ষণিকের জন্য। আবার নিবেও গেল। শিরদাঁড়ায় একটা বরফের স্রোত অনুভব করছিল তাপস। ঘুরিয়ে নিল মুখ।

পুলিশ অফিসার হেলান দিয়েছে চেয়ারে,—আফশোসটা কী জানেন? যে ডিবচটির জন্য মহিলা সুইসাইড করলেন তিনি হয়তো যবনিকার আড়ালেই থেকে যাবেন। রাত্রিদেবীর মতো মহিলাদের ভালোমানুষির জন্য এই সব হারামীর বাচ্চাগুলো শালা ধরাও পড়ে না, পাঁকালমাছের মতো এস্‌কেপ করে যায়। একটা সুইসাইড নোটও উনি রেখে গেলেন না! যদি একটা হিন্ট্‌সও পেতাম.....!

পুলিশ অফিসার হাতে হাত ঘষছে, মুঠো পাকাচ্ছে। ভাবটা এমন একবার ধরতে পেলে আচ্ছাসে পালিশ করতাম!

তাপস আর এক মুহূর্ত এখানে তিষ্ঠোতে পারছে না। ঢোঁক গিলে মরিয়া গলায় বলল, —আমাদের রিপোর্টটা.....?

—হ্যাঁ। পুলিশ অফিসার বাস্তবে ফিরল, —মোটামুটি কী অ্যাংগেলে রিপোর্টটা লিখলাম বলে দিচ্ছি। সো অ্যান্ড সো ডেটে, সো অ্যান্ড সো সময়ে রাত্রি মজুমদারকে তাঁর হোস্টেলের বাথরুমে অ্যাসিড খাওয়া অবস্থায় পাওয়া যায়, তখনও তাঁর প্রাণ ছিল, হসপিটালে আনার পর তিনি মারা যান, অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হওয়ার দরুন তাঁর বডি পোস্টমর্টেমে পাঠানো হয়েছে, ময়নাতদন্তের পর লাশ তাঁর বাড়ির লোকের হাতে তুলে দেওয়া যেতে পারে.....। ঠিক আছে?

তাপস ঢক করে ঘাড় নাড়ল।

—আমি একজন কনস্টেবলকে আপনাদের সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি, সেই রিপোর্টটা নিয়ে যাবে। এতক্ষণ পর পুলিশ অফিসারের মুখে এক চিলতে হাসি দেখা গেল,—ওকে একটু ভালো করে চা-টা খাইয়ে দেবেন।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল তাপস। দীপুর পিঠে হাত রেখে বলল,—ওঠো। তোমার নন্টুদা- মন্টুদারা বোধহয় এতক্ষণে অস্থির হয়ে উঠেছে। সেই কোন সকালে সবাই মর্গে পৌঁছে গেছে।....

পুলিশ অফিসার কুট কাটল,—যান, বডি দাহ করা ছাড়া আপনাদেরও তো

আর কিছু করার নেই। রাত্রিদেবী আমাদেরও অন্ধকারে রেখে গেলেন, আপনাদেরও।

দীপুর দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে গেছে। উঠল কলের পুতুলের মতো। বেরিয়ে এসেছে তাপসের পেছন পেছন। গাড়িতে এসে বসল দুজনে। অপেক্ষা করছে কনস্টেবলটার জন্য।

তাপস স্বাভাবিক করতে চাইল দীপুকে। সেই সঙ্গে বুঝি নিজেকেও। বলল,—শক্ত হও দীপু। এখন কিছুতেই ভেঙে পড়লে চলবে না।

দীপু আস্তে মাথা নাড়াল। একটুক্ষণ চুপ থেকে গিলতে চাইল উদ্‌গত কান্নাটাকে। তারপর বলল,—পর্ণাদি একটা নতুন শাড়ি দিয়ে দিয়েছে। দিদির জন্য। বলেছে মুন্নিদি হয়তো মর্গে যাবে, মুন্নিদি যেন দিদিকে শাড়িটা পরিয়ে দেয়।

—হুম্।

—আমরা কি দিদির জন্য একটু ফুল কিনে নেব তাপসদা? দীপু আর আটকাতে পারল না কান্নাটাকে, ফুঁপিয়ে উঠল,—দিদি রজনীগন্ধা খুব ভালোবাসত।

তাপসেরও কান্না এসে গেল। গলার শক্ত ডেলাটাকে গিলে নিয়ে মনে মনে বলল, হারামীর বাচ্চাটা কি জানে না তোমার দিদি কী কী ভালোবাসত!

সাত

মর্গ থেকে বেরিয়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে রাত্রির লাশ। প্রায় তিরিশ ঘণ্টা আগে। এই দুনিয়ার কোথাও আর রাত্রির অস্তিত্ব নেই। তবু যে কেন তাপসের ঘুম আসছে না?

তাপসের খোলা চোখের সামনে এখন গাঢ় অন্ধকার। গাঢ় নীল নয়, ঘোর কালো অন্ধকার। সেই অন্ধকারটাই এখনও হাতড়ে চলেছে তাপস। কেন মরল রাত্রি? তাপস কি ওই মৃত্যুর জন্য সত্যিই পুরোপুরি দায়ী?

মর্গে ডাক্তারের সঙ্গে আলাদাভাবে দেখা করেছিল তাপস। তিনি আশ্বস্ত করেছেন রাত্রি গর্ভবতী ছিল না। তাহলে কেন এই মৃত্যু? ক্রমশ যেন প্রহেলিকা হয়ে উঠছে রাত্রি। এমন কি হতে পারে, তাপস ছাড়া অন্য কোনও পুরুষ এসেছিল রাত্রির জীবনে? হতে পারে। হতেই পারে। তাপসকে হয়তো মুখ ফুটে বলতে পারছিল না, হয়তো ভয়ংকর দোটানায় পড়ে গিয়েছিল! রাত্রির সঙ্গে তাপসের দেখা হত এক-দু সপ্তাহ পর পর। কখনও বা কুড়ি-বাইশ দিন। মাঝের দিনগুলো কীভাবে কাটাত রাত্রি? হোস্টেলের মেয়েগুলো তো বললই রাত্রির সঙ্গে কারুর তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। অতএব তাদের সঙ্গে সময় কাটানোর প্রশ্ন আসে না। রাত্রির শোরুমের তিন-চারজন কলিগ এসেছিল বিকেলে, তাপসের বাড়িতে। তারা তো আবার রাত্রির সম্পর্কে অন্যরকম কথা বলে গেল। রাত্রি নাকি কাজে গিয়ে খুব হাসিখুশি থাকত, যা একেবারেই তার স্বভাবের সঙ্গে মানায় না। তবে ছুটির পর একটা সেকেণ্ডও তাদের সঙ্গে কাটাত না রাত্রি। আত্মীয়স্বজনদের বাড়িও তো প্রায় যেতই না। তাহলে এমনি সময়টা কী করত রাত্রি? বই পড়ার তেমন নেশা ছিল না, টিভি দেখার শখ ছিল না, সর্বক্ষণ যে গান-টান শুনত তাও নয়। চুপটি করে শুয়ে থাকত হোস্টেলে? উঁহু, তাহলেও তো হোস্টেলের মেয়েরা বলত। অবশ্যই আর কারুর সঙ্গে রাত্রির পরিচয় হয়েছিল। ঘনিষ্ঠতাও। তাই অত মনমরা ভাব, তাপসের সান্নিধ্যে ক্ষণে ক্ষণে আনমনা হয়ে যাওয়া.........।

চিন্তাটা ক্রমশ দখল করে নিচ্ছে তাপসের মস্তিষ্ক। রাত্রি কি তাহলে তাপসকে পুরোপুরি ভালোবাসতে পারেনি? তাপসের কাছে রাত্রি কৃতজ্ঞ থাকতে পারে, কিন্তু ভালোবাসা.....? ভালোবাসা, অর্থাৎ পুরুষরা মেয়েদের কাছ থেকে যা চায়। শতকরা একশো ভাগ বিশ্বস্ততা। রাত্রির পুরো আনুগত্যই যদি না সে পেয়ে থাকে, তবে

কেন রাত্রির মৃত্যুর জন্য আদৌ সে দায়ী ভাববে নিজেকে? রাত্রির মৃত্যুর আড়াই দিন পরেও কেন রাত্রির চিন্তায় নষ্ট করবে তার নিশ্চিন্ত ঘুম?

মন কী বিচিত্রগামী! বিবেকটাকে সাফ করার জন্য কত রকম অজুহাতই না খুঁজে নিতে পারে!

সাজানো যুক্তিগুলো প্রাণপণে আত্মস্থ করার চেষ্টা করে চলেছে তাপস। আচমকা বাইরে কোথাও একটা শব্দ বেজে উঠল। শব্দ? না পাখির ডাক? রাত্রিবেলা কলকাতায় কোন পাখি ডাকে?

তাপস ধড়মড়িয়ে উঠে বসল বিছানায়। উঁহু, বিছানা নয়, ডিভান। বেডরুমে শুভামাসি আর পিংকিকে নিয়ে শুয়েছে পর্ণা, দীপু বুম্বার খাটে। ড্রয়িংরুমে তাপস একা।

আবার শব্দটা বাজছে। ভীষণ চেনা শব্দ। কোথায় শুনেছে? ডায়মন্ডহারবারের হোটেলে? ফুলেশ্বরের ডাকবাংলোয়? টাকির ট্যুরিস্ট লজে? কোথায়? শব্দের স্থানটাকে মনে না পড়লেও রাতটাকে স্মরণ করতে পারল তাপস। বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে কোনও এক নারীশরীরকে সে বলেছিল,—আমি তোমাকে এক মুহূর্ত ভুলতে পারি না। যখনই চোখ বুজি, তোমাকে দেখতে পাই।

ডায়মন্ডহারবারেও কি কথাটা বলেছিল তাপস? এই সেদিন? নারীশরীর কি ধরে ফেলেছিল তাপসের ছলনা? তবে কেন সেদিন বলল, আমি মরে গেলে তিন দিনও আমায় মনে রাখবে তো!

এই সত্যটুকু জানার জন্যই কি মরে যায় রাত্রিরা? মরে গেল?

আবার শব্দটা বাজছে। ডিভান ছেড়ে নামল তাপস। অন্ধকার হাতড়ে সুইচ টিপে টিউবলাইটটা জ্বালিয়েছে। ফ্যাটফেটে আলো, চোখে ধাক্কা মারছে, চোখ কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। গলা শুকিয়ে গেছে, ফ্রিজ খুলে ঢকঢক ঠাণ্ডা জল ঢালল গলায়। তবু যেন ভেতরটা জুড়োল না। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল কেউ জেগে আছে কিনা। খানিক আগে শোওয়ার ঘর থেকে শুভামাসির কান্নার আওয়াজ আসছিল, এখন চারদিক নিঝুম। এত নিঝুম যে কেমন গা ছমছম করে। পর্ণাকে কি গিয়ে একবার আস্তে করে ডাকবে তাপস? এই মুহূর্তে একাকীত্ব যে বড় ভয়ংকর। যদি পর্ণা একটু পাশে এসে বসে। যদি একটু সঙ্গ দেয়। একা একা শুলেই তো এখনই ভেসে উঠবে রাত্রির মুখ। হয়তো বা ডেকে উঠবে সেই রাতচরা পাখিটা।

থাক। ঘুমোক পর্ণা। পায়ে পায়ে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল নিঃসঙ্গ তাপস। এসেই চমকেছে। বেতের চেয়ারে কে বসে? রাত্রি না? সেই এলানো হাত, সেই খোলা চুল, সেই উদাস বসে থাকা?

তাপসের পায়ের আওয়াজ পেয়ে রাত্রি ঘুরে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে তাপসের ভুল ভেঙেছে। রাত্রি কোথায়, এ তো পিংকি! শাড়ি পরা সতেরো বছরের পিংকি যেন রাত্রিরই ছায়াবিম্ব!

ঘড়ঘড়ে গলায় তাপস বলল,—তুমি এখানে?

—ঘুম আসছে না তাপসদা, একদম ঘুম আসছে না।

—তা বলে এভাবে জেগে বসে থাকবে? যাও, শোও গিয়ে।

—ইচ্ছে করছে না। বলেই পিংকি হঠাৎ ডুকরে উঠেছে,—আমাদের এবার কী হবে তাপসদা? কী করে চলবে? দিদিটা আমাদের এইভাবে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল.....!

পিংকির খোলা চুলে হাত রাখল তাপস। বলল,—ভেবো না, আমি তো আছি।

আশ্চর্য, তাপসের হাতও নড়ল না, গলায় স্বরও ফুটল না। সে দাঁড়িয়ে আছে নির্বাক। নিস্পন্দ।